লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্

আহমদী বুলেটীন

১৫ জুন, ২০০৪

(আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের তা'লীম-তরবিয়তের উদ্দেশ্যে)

হল্যান্ডে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)

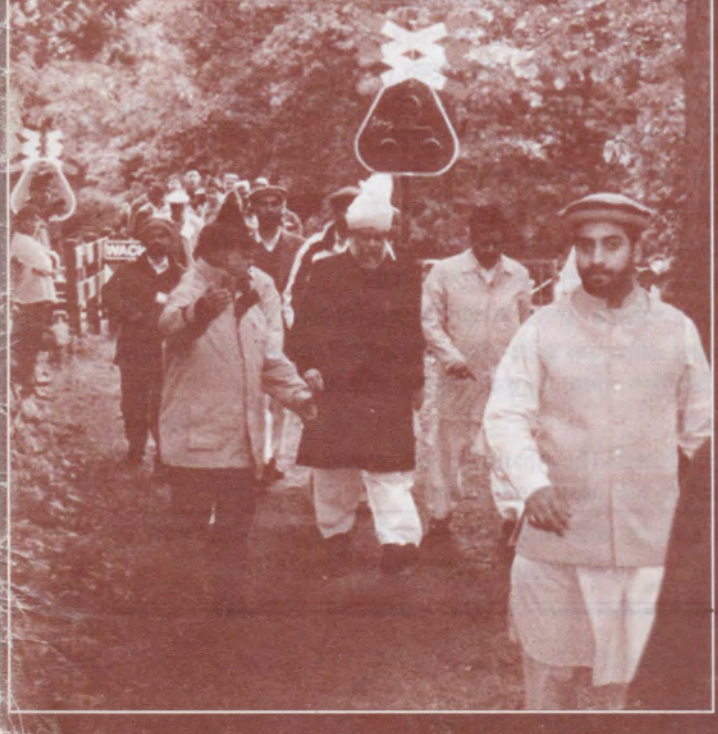

সম্পাদকীয়

যে কথা বলা অসঙ্গত হবে না

অনেক মানবাধিকার কর্মী ও সচেতন রাজনীতিবিদের পর এবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় দপ্তরে চলমান অত্যাচার ও অনাচারের প্রেক্ষিতে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে এলেন মার্কিন উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিস ক্রিষ্টিনা রোকা। প্রায় পৌনে এক ঘন্টা দীর্ঘ এ বৈঠকে তিনি আহমদীয়া জামাতের প্রতিনিধিবর্গের সাথে আলাপ ও মত বিনিময় করেন। গত প্রায় আট মাস ধরে চলমান আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশ-বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা যে বলিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা রেখেছেন রোকার এ আগমন সেই সোচ্চার প্রতিবাদের ফলশ্রুতিতে ঘটেছিল বলেই মনে হয়।

মহানবী (সঃ)-এর শিক্ষানুযায়ী কোন জাতির নেতা আসলে তাকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। আহমদীয়া জামাত এ শিক্ষানুসারে মার্কিন নেত্রী ও প্রতিনিধিদের সৌহার্দ্য ও সম্মান প্রদর্শন করেন। আহমদীয়া বিরোধী অনেক আলেম ও নেতা যখন আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে জানতে চান তখনও আহমদীরা একই শিক্ষার ওপর আমল করে থাকে।

মেহমানদারী করা ইসলামী শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মেহমানদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে মেহমানদারী করতেন। নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দলকে তিনি যথাবিহিত সম্মানের সাথে আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। এমনকি তাদের উপাসনার সময় হলে তাদেরকে মসজিদে নববীতে উপাসনার সুযোগ দেন (যুরকানী)। এ নিয়ে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করে থাকেন। মিস রোকা বকশী বাজার থেকে সরাসরি জামাতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। কেউ যদি এ ব্যাপারেও বিরূপ সমালোচনা করেন তাহলে তা আটকাবে কে?

পত্রিকান্তরে জানা গেছে মাওলানা নিজামী সাহেব নাকি বলেছেন, আহমদীদের ইসলাম ধর্ম পালন করতে দেয়া হবে না। ইসলাম তো কারও কবলা করা বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নয়। নবী করীম (সঃ) যেমন 'রহমাতুল্লিল আলামীন' এবং 'কাফ্ফা তাল্লিন্নাস' তেমন ইসলাম সারা জগতের মানবমন্ডলীর জন্যে। সুতরাং মানব মাত্রই ইসলাম ধর্মের অনুশাসন লালন ও পালন করতে পারে। এখানে কারও একচেটিয়া অধিকার নেই বা কেউ ইসলাম পালনে কাউকে বাধা দিতে পারে না। অবশ্য কেউ পেশী শক্তি প্রয়োগ করলে সে কথা ভিন্ন।

উল্লেখ্য, ইদানিং আহমদী জামাতের বিরোধিতাকারী কোন কোন মৌলবাদী গোষ্ঠী সরকারী ছত্রছায়ায় আহমদী জামাতের মসজিদে গিয়ে 'কাদিয়ানী উপাসনালয়' নামে সাইন বোর্ড লাগিয়ে দিচ্ছেন। অথচ তারা জানেন না বা জানতে চেষ্টাও করেন না যে, তারা এ কাজটি করে আল্লাহ্‌র কালামে পাকের খেলাফ করছেন ঃ

"নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত। আর আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সূরা তাওবা ঃ ১৮, তফসীর মা'রেফুল কুরআন)।

আহমদী জামাত আল্লাহ্‌র ফযলে কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের প্রত্যেকটি কথার ওপরে ঈমান রাখে ও আমল করে। সুতরাং আহমদীরা ইসলামের অন্যান্য ফিরকার ন্যায় তাদের ইবাদতগাহকে মসজিদ বলার অধিকার রাখে। আহমদীদের মসজিদকে শতবার 'কাদিয়ানী উপাসনালয়' লিখলেও তা মসজিদই এবং থাকবেও তা-ই। আমরা এহেন ন্যাক্কারজনক কাজ থেকে তাদেরকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বিবিসি'র সাক্ষাৎকারে আহমদীদের পুস্তক-পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি প্রথমে অস্বীকার করেন আর বলেন, এ ব্যাপারে তো কোন গেজেট বের হয়নি। অথচ রংপুরের বদরগঞ্জ থানায়, পঞ্চগরের আহমদনগরে ও পটুয়াখালীর আহমদী জামাতের মসজিদে গিয়ে মৌলভীরা পুলিশের সহায়তায় কথিত বাজেয়াপ্ত পুস্তক ও কুরআন শরীফ খোঁজার নামে আহমদীদের হয়রানী করছেন। এসব খবর পত্র-পত্রিকায়ও এসেছে। সুতরাং সরকারের একজন বিশেষ মন্ত্রী হয়ে তিনি কি করে এটাকে অস্বীকার করলেন। আবার পরের দিন মন্ত্রী মহোদয় বল্লেন, কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগলে সে বিষয় তো আমাদের দেখতেই হবে। ধর্মীয় অনুভূতিতে কেবল আঘাত লাগে আহমদীদের বেলায়? মূর্তি পূজা করলে আর হযরত ঈসাকে খোদার পুত্র খোদাবন্দ মসীহ্ বল্লে ধর্মীয় অনুভূতিতে তো বেশি আঘাত লাগার কথা। সুতরাং যত দোষ নন্দ ঘোষ। আহমদীরা যেহেতু সংখ্যালঘিষ্ঠ তাই তারাই দোষী। তবে একথাও মনে রাখা দরকার প্রত্যেক যুগ-ইমামের জামাত প্রথমে সংখ্যালঘিষ্ঠই থাকে।

আহমদীরা এ দেশের সন্তান। এর আলো বাতাসে বেড়ে উঠেছে তারা। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদেরও রক্ত ঝরেছে। সুতরাং অন্যদের মত তাদেরও এদেশে শান্তিতে বসবাস করার অধিকার রয়েছে। নিজস্ব আকিদা বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম পালন ও প্রচার তাদের সাংবিধানিক অধিকার। এ অধিকারের রক্ষক হলেন সদাশয় সরকার। আমরা সরকারের কাছে ন্যায্য অধিকার পাওয়ার আশা করছি এবং ইসলামের অন্যান্য ফিরকার মত আহমদীরা যাতে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ধর্ম-কর্ম করতে পারে সেজন্যে সরকারের আশু সুদৃষ্টি কামনা করছি।

□ ১৫ জুন, ২০০৪

বিষয় - সূচী পৃষ্ঠা নং

- কুরআন শরীফ ৩
- হাদীস শরীফ ৩
- অমৃতবাণী ৪
- মসীহ্ হিন্দুস্থান মেঁ ৪
  হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)
- আমিত্ব ও অহংকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই শোভা পায় ৫-১১
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)
- জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্‌তাআলার 'খবীর' সিফতের ব্যাখ্যা ১২-১৬
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ))
- ঐশী বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান ও সত্য ১৭
  হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)
- আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে? ১৮-১৯
  মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ, লন্ডন
- আমার স্মৃতিতে তারুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ২০
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর ২১-২৩
  ঐতিহাসিক পশ্চিম আফ্রিকা সফরের প্রতিবেদন
- সংবাদ ২৪-২৬
- Bangladesh-The Ahamadiyya Community- their rights must be protected ২৭-৩২

প্রচ্ছদ ঃ হল্যান্ডে আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)
(সৌজন্যে ঃ জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী)

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ আন্‌ফাল- ৮

৫৩। (অবস্থাটি)[১১৩১-ক] ফেরাউনের জাতি ও তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মতই; তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের পাপের জন্য শাস্তি দিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর কঠোর শাস্তিদাতা।

৫৪। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ কোন জাতির প্রতি কোন নেয়ামত নাযেল করে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা নিজেরা নিজেদের (অভ্যন্তরীণ) অবস্থার পরিবর্তন না করে[১১৩২] এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৫৫। (অবস্থাটি), ফেরাউনের জাতি ও তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মতই; তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে[১১৩৩] প্রত্যাখ্যান করেছিল, অতএব আমরা তাদেরকে তাদের পাপের জন্য ধ্বংস করেছিলাম। আর আমরা ফেরাউনের জাতিকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম এবং তারা সকলেই ছিল যালেম।

৫৬। যারা অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে তারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিশ্চয় নিকৃষ্টতম জীব। অতএব তারা আদৌ ঈমান আনবে না।

৫৭। অর্থাৎ তারা যাদের সাথে তুমি চুক্তি-বদ্ধ[১১৩৪] হয়েছ তা সত্ত্বেও প্রতিবারই তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আর তারা তাকওয়া অবলম্বন করে না।

৫৮। অতএব যুদ্ধ চলাকালে তুমি এদের বাগে পেলে এদের (সমুচিত শিক্ষা দেয়ার) মাধ্যমে এদের পেছনের লোকদের ছত্রভঙ্গ[১১৩৫] করে দিবে যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

১১৩১-ক। 'দাব' অর্থ অভ্যাস, রীতি-নীতি, বিষয়, অবস্থা, ঘটনা (আকরাব)।

১১৩২। এ আয়াতে একটি সাধারণ ঐশী-নিয়ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা কোন মানব গোষ্ঠীকে তারা নিজেরা প্রথমে তাদের অবস্থাকে অবনতির দিকে পরিবর্তন না করা পর্যন্ত পূর্বে প্রদত্ত তাঁর কোন অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেন না।

১১৩৩। আয়াত অর্থ সংবাদ, আদেশ, নির্দেশ, নিদর্শন, কুরআনের আয়াত বিশেষ (লেইন)।

১১৩৪। তারা বারংবার তাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্‌তাআলার নামে গৃহীত চুক্তির অমর্যাদা করে।

১১৩৫। আয়াতে বিশ্বাসীদেরকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া অস্ত্র ধারণ না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন হলে অত্যন্ত নির্ভীক চিত্তে লড়তে হবে এবং শত্রুকে সাহসিকতার সঙ্গে আঘাত হানতে হবে যাতে তাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। দুর্বল ও বিলম্বিত কৌশলে যুদ্ধ করা বিচক্ষণতার কাজ নয়। যুদ্ধ যদি করতেই হয় তা হলে তা দ্রুত এবং চরমভাবে করা উচিত।

হাদীস শরীফ

দৃঢ়-বিশ্বাস

হাদীস ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি চমৎকার দায়িত্ব গ্রহণকারী আর লোকেরা যখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সাথীদেরকে বলেছিল, 'মুশরিকরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে তোমরা তাদেরকে ভয় কর।' তখন এতে তাদের ঈমান বেড়ে গেছে এবং তারা বলেছে, "আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম দায়িত্ব গ্রহণকারী" (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দাগণের ইতিহাস থেকে জানা যায় তারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌তাআলার উপর ভরসা করতেন। বিপদের পাহাড় তাদেরকে নড়াতে পারেনি। বরং বিপদাবলী তাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ তারা তাদের খোদার আশীষকে প্রত্যক্ষ করেছিল। আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দাদের উপর বিপদ নিপতিত হলে তারা দোয়া ও ধৈর্যের দ্বারা আল্লাহ্‌র সাহায্যকে অন্বেষণ করে আর এ উপায় অবলম্বন করে মু'মিনগণ সর্বদা শত্রুর উপর জয়যুক্ত হয়েছে। কুরআনের সূরা আনফালের এ আয়াতে আল্লাহ্ জানাচ্ছেন, মু'মিনদের জীবনে খোদাতাআলার স্থান অগ্রগণ্য। তাদের অবস্থা এরূপ যে, খোদার স্মরণে তাদের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠে অন্তর কেঁপে উঠে। তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে।

হাদীসটিতে আহযাবের যুদ্ধাবস্থার বর্ণনা রয়েছে। মদীনার মুষ্টিমেয় মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে মক্কার কাফিররা ইহুদীদের সহ চড়াও হয়েছিল। সে সময় হযরত নবী করীম (সঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর শত্রুদের সমাগম মুসলমানদের ঈমান বৃদ্ধি করে কারণ তারা জানতো এখন আল্লাহ্‌তাআলা অবশ্যই তাঁর নিদর্শন দেখাবেন। আর তা-ই হয়েছিল। আল্লাহ্‌তাআলার উপর ভরসাকারী মু'মিনদের শত্রুদের আল্লাহ্‌তাআলা যুদ্ধ করার ক্ষমতাই দেয়নি। মু'মিনগণ বিনা যুদ্ধে জয় লাভ করে খোদাতাআলার নির্দেশকে প্রত্যক্ষ করে। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরোধীরা সমবেত হয়ে আহমদীদের মিটিয়ে দেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। আমরা আল্লাহ্‌তাআলার উপর ভরসাকারী, তাঁরই আশীষের কাঙ্গাল ও যাচ্না করি। এবং আশা রাখি তিনি অবশ্যই তাঁর অঙ্গীকার আমাদের ক্ষেত্রে পূর্ণ করবেন। কিন্তু এর জন্য খোদার নিকট আমাদের দোয়া ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে হবে। দোয়া না করলে খোদাতাআলা আমাদের কোন পরওয়া করবেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "যে-ব্যক্তি তার জন্য আগুনে নিপতিত তাকে আগুন হতে মুক্তি দেয়া হবে। যে তার জন্য কাঁদে সে হাসবে। যে তাঁর জন্য দুনিয়াকে বিসর্জন দেয় সে তাঁকে লাভ করবে। তোমরা সত্য-নিষ্ঠা, পূর্ণ সততা ও তৎপরতার সাথে অগ্রসর হয়ে খোদার বন্ধু হয়ে যাও যেন তিনি তোমাদের বন্ধু হয়ে যান ... অতএব নিষ্ঠার সাথে তোমরা তাকে আঁকড়ে ধর যেন তিনি এ বিপদাবলী তোমাদের নিকট থেকে দূরে রাখেন। আকাশ হতে আদেশ না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়াতে কোন বিপদ দেখা দেয় না এবং কোন দুর্দশা দূর হয় না যে পর্যন্ত আকাশ হতে তাঁর দয়া বর্ষিত হয় না। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই যে, তোমরা শাখাকে না ধরে মূলকে অবলম্বন কর" (কিশ্‌তিয়ে নূহ্, পৃঃ ২৪)।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র প্রতিটি নির্দেশের উপর আমল করার ও তাঁর উপর তাওয়াক্কাল করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

স্বাস্থ্যকে বিনষ্ট করবেন না!

বারে বারে খাওয়া সঠিক নয়। অর্থাৎ এক খাবার খাওয়ার পরে আবার কিছু আরও খেয়ে নিলেন, আবারও কিছু খেলেন। ফল এটাই হবে, বদ হজম হয়ে দাস্ত ও বমি বা অন্য কোন রোগের সৃষ্টি হবে" (মলফূযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১)।

কবিরাজগণ লেখেন, "শারীরিক ব্যায়াম ঔষধ ব্যবহারের চেয়ে উত্তম" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯০)।

"প্রত্যেক ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন লাভ করতে চায় ... কুরআন শরীফ একটি নিয়ম বলেছে ... (সূরা রা'দ ১৮) অর্থাৎ যে কল্যাণপ্রদ সত্তায় পরিণত হয় তার দীর্ঘ জীবন লাভ হয় ... সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এটাই যে, পরিশ্রম করে মেধা খাটিয়ে এমন পথ বের করে যে, অন্যদের কল্যাণ লাভ হয় যেন দীর্ঘ জীবন লাভ হয়" (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২২১)।

"মানুষের অবশ্য কর্তব্য যে, সে (লোকদের মাঝে সে উত্তম যে তাদের কল্যাণ পৌছায়) এমন সত্তায় পরিণত হওয়ার চিন্তা করে ও পড়াশুনা করে। যেভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যবস্থা অবলম্বন কাজে আসে এভাবেই উপকার সাধন ও কল্যাণ সাধনেও তদবীরই কাজে আসে। এ জন্যে আবশ্যক, মানুষ সব সময় এ সুযোগ ও চেষ্টায় লেগে থাকে, কোন্ পথে অন্যের উপকার সাধন করা যায় (মলফূযাত প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৩)।

হযরত আকদস জুন ১৪, ১৯০২-এর মজলিসে ইরফানে পান, হুক্কা, জর্দা, তামাক, আফিম প্রভৃতির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "সুস্বাস্থ্যকে কোন নিরর্থক বস্তু দিয়ে কখনও নষ্ট করা উচিত নয়। শরীয়ত উত্তমভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, এসব স্বাস্থ্য বিনাশক বস্তুগুলোকে ঈমানের জন্যে ক্ষতিকারক সাব্যস্ত করেছে আর এদের মাঝে সেরা হলো মদ" (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৯)।

(দৈনিক আল্ ফযল ২৩ জানুয়ারী, ২০০৪ এর সৌজন্যে)।

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদি থেকে যে সকল সাক্ষ্য ও তথ্যপ্রমাণ আমরা খুঁজে পেয়েছি এগুলোর একটি হচ্ছে সেই সাক্ষ্য যা ওল্ডেনবার্গ রচিত 'বুদ্ধিজম' গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ গ্রন্থটিতে 'মহাওয়াগা' পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠা, ১ম পরিচ্ছেদের উদ্ধৃতি মূলে লিখা আছে ঃ 'গৌতম বুদ্ধের 'রাহুলতা' নামের একজন স্থলাভিষিক্তও গত হয়েছেন, যিনি কেবল তাঁর আত্মোৎসর্গীকৃত শিষ্যই ছিলেন না, বরং তিনি তাঁর পুত্র ছিলেন।' এখন এ স্থলে আমরা দাবীর সাথে বলছি, বৌদ্ধ ধর্মের বই-পুস্তকে যে রাহুলতা নামের উল্লেখ এসেছে, এ শব্দটি 'রূহুল্লাহ্' নামেরই পরিবর্তিত রূপ। এটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর এক নাম। আর এ 'রাহুলতা' গৌতম বুদ্ধের পুত্র ছিল, যাকে তিনি দুগ্ধপানরত অবস্থায় ফেলে দিয়ে কোন দূরদেশে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকেও ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে, তাকে না জানিয়ে ও চিরবিচ্ছেদের নিয়্যতে অন্য কোন দেশে ভেগে গিয়েছিলেন। এ কেস্‌সাটি একেবারেই বাজে ও অহেতুক এবং বুদ্ধের মর্যাদা বিরোধী বলেই প্রতীয়মান হয়। এমন কঠোর হৃদয়, যালেম স্বভাব ব্যক্তি, যে তার অসহায় স্ত্রীর প্রতি একটুও দয়া করেনি- তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে, তাকে কোন রকম আশ্বাস না দিয়ে চোরের ন্যায় কেটে পড়ে এবং দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিসর্জন দেয়-না তালাক দেয়, না অনির্দিষ্ট কালের সফরে যাওয়ার জন্য অনুমতি নেয়। বরং হঠাৎই নিজের নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ায় স্ত্রীর মনে চরম আঘাত দিল, তাকে কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করালো। তাকে কোন চিঠি পর্যন্ত পাঠালো না। এমন কি, পুত্র যুবকে পরিণত হলো। দুগ্ধপোষ্য পুত্রের প্রতিও দয়া করল না। এমন ব্যক্তি কখনও সত্যপরায়ণ মহাপুরুষ হতে পারেন না যিনি তাঁর সেই নৈতিক শিক্ষারও ধার ধারলেন না, যে শিক্ষা তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রদান করতেন। আমাদের বিবেক এ বৃত্তান্তটিকে মেনে নিতে পারে না যেমন ইঞ্জিলে বর্ণিত এ গল্পটিকে মেনে নিতে পারে না যে, মসীহ্ কিনা তাঁর মায়ের আসায় ও তাঁকে ডাকায় কোন ভ্রুক্ষেপ করেন নি। বরং এমন কথা বলে ফেলেন যা মায়ের অমর্যাদার কারণ ছিল।

অতএব স্ত্রী এবং মায়ের মনে আঘাত দেয়ার এ গল্প দু'টোতে যদিও বুদ্ধ ও মসীহ্‌র মাঝে পরস্পর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু আমরা সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধ থেকেও স্খলিত এমন বৃত্তান্ত হযরত মসীহ্ বা গৌতম বুদ্ধের কারও প্রতিই আরোপ করতে পারি না। স্ত্রীর প্রতি বুদ্ধের স্নেহ-ভালবাসা না-ই বা ছিল, তবে কি অবলা নারী ও স্তন্যপায়ী শিশুর প্রতিও তাঁর কোন দয়া-মায়া ছিল না? এ এমন এক গুরুতর অসদাচরণ যে, শত শত বছর আগের এ বৃত্তান্তটি শুনে এখনও আমাদের কষ্ট দেয়, কেন তিনি এমনটি করলেন। মানুষের পক্ষে তার স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি প্রদানে অবজ্ঞা তার পাপী হবার জন্যে যথেষ্ট। তবে সে স্ত্রী যদি দুশ্চরিত্রা ও স্বামীর অবাধ্য হয়ে যায় অথবা অধার্মিক, অহীতাকাঙ্ক্ষী ও প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ভিন্ন কথা। অতএব আমরা এমন নোংরা কার্যকলাপ বুদ্ধের দিকে আরোপ করতে পারি না, যা স্বয়ং তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলীরও পরিপন্থী। অতএব এ যুক্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, এ গল্পটি অসত্য। প্রকৃতপক্ষে 'রাহুলতা' বলতে হযরত ঈসাকে বুঝায়, যাঁর একটি নাম হচ্ছে 'রূহুল্লাহ্'। হিব্রু ভাষার রূহুল্লাহ্ শব্দটি রাহুলতা শব্দের সাথে অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর রাহুলতা তথা রূহুল্লাহ্‌কে পূর্বোল্লেখিত কারণেই বুদ্ধের শিষ্য বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ মসীহ্ যে পরে এসে বুদ্ধের (হুবহু) সদৃশ শিক্ষা আনয়ন করেন সেজন্যে বৌদ্ধধর্মের লোকেরা সে শিক্ষার মূল উৎস বুদ্ধকে নির্ধারণ ক'রে মসীহ্‌কে তাঁর শিষ্য আখ্যা দিয়ে দেয়। আবার বুদ্ধ খোদাতাআলার পক্ষ থেকে ইলহাম (ঐশী-বাণী) পেয়ে হযরত মসীহ্‌কে তাঁর পুত্র আখ্যা দিয়ে থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে একটি বড় যৌক্তিক কারণ হচ্ছে, এ গ্রন্থেই লিখা আছে যে, রাহুলতাকে যখন তার মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো তখন 'মগ্‌দালিয়ানা' নামক বুদ্ধের এক শিষ্যা তাঁর জন্যে অন্তর্বর্তী দূত হিসেবে কাজ করেছিল। এখন লক্ষ্য করুন, মগ্‌দালিয়ানা নামটি প্রকৃত পক্ষে 'মগদলিনি' থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, মগদলিনি নামের একজন মহিলা হযরত ঈসার শিষ্যা ছিলেন। ইঞ্জিলে তার উল্লেখ রয়েছে। (চলবে)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আমিত্ব ও অহংকার একমাত্র আল্লাহ্‌কেই শোভা পায়

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ২৯ আগষ্ট, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ বায়তুল ফুতূহ্, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

এবারের লন্ডন জলসার শেষ দিন আমি বয়াতের শর্তগুলো সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলাম। সময়ের অভাবে সবক'টি শর্ত সম্পর্কে বলা হয়নি। এ যাবত ছয়টি শর্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে। আজ আরো দু'টি সম্পর্কে বলার ইচ্ছা আছে।

সপ্তম শর্তটি এ রকম-

"ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা বিনয় শিষ্টাচার ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবে।"

শয়তান প্রথম দিন অহংকার প্রদর্শন করার পর থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, আমি মানুষকে আল্লাহ্‌র বান্দা (অনুগত) হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করব। বিভিন্ন উপায়ে আমি মানুষকে নিজের চক্রান্তের জালে জড়িয়ে ফেলব এবং সে যদি কিছু পুণ্যকর্ম করেও তবুও তাকে অহংকারের মাঝে নিয়ে যাব যেন সে আস্তে আস্তে অহংকার প্রদর্শন করে সেই পুণ্যের সওয়াব বা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং শয়তান প্রথম দিনই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, মানুষকে সে সৎ পথ থেকে পথভ্রষ্ট করবে এবং সে নিজেও তো অহংকারের কারণে আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ মানতে অস্বীকার করেছিল। অতএব সে এই অস্ত্রই মানুষের উপর বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে।

কেবল আল্লাহ্‌র খাস বান্দা যারা ইবাদুর রহমান এবং এবাদত বন্দেগী করেন কেবল তারাই ওর ওসব চক্রান্ত থেকে রক্ষা পান, বেঁচে যান। তাছাড়া সাধারণত সবাইকে শয়তান অহংকারের মাধ্যমে সে নিজের জালে জড়িয়ে ফেলে। সুতরাং এ বিষয়টাকে অতি সাধারণ বিষয় মনে করা উচিত নয়। আমরা বয়াত করার সময় এ শর্ত কবুল করে নিয়েছি যে, আমরা অহংকার করব না। আমিত্ব প্রদর্শন করব না এবং একে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করব। এ কাজটি বড় সহজ কাজ নয়। এর অনেক প্রকারভেদ রয়েছে, এর মাধ্যমে শয়তান মানুষের উপর আক্রমণ করে থাকে। অত্যন্ত ভীতিপ্রদ অবস্থান। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তাআলার ফযলই মানুষকে এথেকে রক্ষা করতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র ফযলকে লাভ করার উদ্দেশ্যে বয়াতের সপ্তম শর্তে পথ রেখে দিয়েছেন। কারণ তোমরা যদি অহংকার পরিত্যাগ কর তারপর যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে তা যদি বিনয় ও দীনতা দিয়ে পূরণ না কর তাহলে অহংকার আবার স্থান দখল করবে। অতএব তোমরা বিনয় অবলম্বন কর কারণ এটাই আল্লাহ্‌তাআলা পসন্দ করেন। হযরত (আঃ) নিজে বিনয় অবলম্বন করেছেন। সম্পূর্ণরূপে বিনয় অবলম্বন করেছেন। এত বেশি বিনয় যে, এর কোন তুলনা হয় না। তাইতো আল্লাহ্‌তাআলা খুশী হয়ে ইলহাম করে বলেছিলেন ঃ

"তোমার বিনয়ের পথকে তিনি পসন্দ করেছেন।"

অতএব আমরা যারা তাঁর বয়াত করেছি বলে দাবী করি, তাঁকে যুগের ইমাম বলে মানি, আমাদের কতটা বিনয়ী হওয়া উচিত। মানুষের এমন কোন উল্লেখযোগ্য অবস্থান নেই যে, সে অহংকার দেখাবে বা জিদ করবে। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

"এবং ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে চলিও না, কারণ তুমি কখনও ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনও উচ্চতায় পর্বত সমান হতে পারবে না" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৮)।

এ আয়াতে খুব সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, মানুষের কি এমন ক্ষমতা আছে যে, কোন কথার উপর সে অহংকারের সাথে দৃঢ় অবস্থান নিতে পারে? অনেকে তো কুয়োর ব্যাঙ হয়, তারা কুয়ো ছেড়ে বের হতেই চায় না। সে ওখানেই বসে থাকে এই বলে যে, আমি যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। এদের এক উদাহরণ আমি এভাবে দেই যে, যেমন ছোট ছোট বৃত্ত হয়, পারিবারিক পরিবেশ যেমন হয়। আপনার গৃহের পরিবেশ যেমন। অনেক পুরুষ এমন হয় যে, তারা নিজ গৃহে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে এমন যুলুম-অত্যাচার করতে থাকে যে, শুনলে আত্মা কেঁপে উঠে। অনেক সময় কন্যারা লিখে যে, আমরা বাল্যকাল পার করে এখন সাবালিকা হয়েছি এখন আমাদের আর সহ্য হচ্ছে না, আমার বাবা আমাদের মায়ের সাথে, আমাদের সাথে শুরু থেকে যুলুম করে চলেছেন। বাবা গৃহে প্রবেশ করতেই আমরা ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ি, নিজেদের রুমে চলে যাই। কখনও মা কোন কথা বলেন, যা বাবার পসন্দ হয় না, সাথে সাথে বাবা যুলুম শুরু করে দেন। এটা সেই অহংকার ছাড়া আর কি? অহংকারের কারণেই তারা এমন করে। এদের অনেকে এমন যে, বাইরের সমাজে সবার সাথে ভাল সম্পর্ক, ভাল আচরণ যে এমন ভাল-ভদ্র আর কেউ হয় না। বাইরের সবই তার পক্ষে সাক্ষী হয়ে যায়। অনেকে বাড়ীর ভেতরে বাইরে একই রকম আচরণ করে, সবাই তাকে সেভাবে চিনে-জানে। এমন অসভ্য আচরণকারীদের সন্তানরা বিশেষ করে পুত্র সন্তানরা যখন যৌবনে উপনীত হয়, ছোট থেকেই বাপের অত্যাচার দেখেছে তাদের মা, ভাই-বোনের সাথে তারা অনেক সময় সামনে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর বাবা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন ছেলেরা প্রতিশোধ নিতে চায়। তাই এভাবে বিভিন্ন প্রকার অহংকারীকে বিভিন্ন পরিমন্ডলে দেখা যায়। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী আছে। একটা পরিমন্ডল ঘরে আর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন পরিমন্ডল আছে। বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন পরিমন্ডলে যদি আপনি খোঁজ করেন তবে অহংকারের বিভিন্ন উদাহরণ দেখতে পাবেন।

অহংকারের সবচেয়ে বড় উদাহরণ যা দেখা যাচ্ছে তা হলো এই, কোন কোন জাতি এবং তাদের দেশের ক্ষমতাসীন সরকার অহংকারের কারণে অপর সবাইকে তুচ্ছ মনে করছে। গরীব জাতি গরীব দেশ

সমূহকে তাদের জুতার তলা মনে করছে। আজকের পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদের বড় কারণ এটাই। অহংকার যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে ফাসাদ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সে সব অহংকারী জাতি ও তাদের সরকার জানে না যে, আল্লাহ্ যখন তাদের অহংকারকে ভেঙ্গে চূরমার করে দিবেন তখন কিন্তু তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, কোথায় চলে গেছে।

আল্লাহ্তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন, "এবং তুমি লোকের সম্মুখে অবজ্ঞা ভরে নিজের গাল ফুলিয়ো না এবং ভূপৃষ্ঠে অহংকারের সাথে চলিও না; কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে আল্লাহ্র আদৌ ভালবাসেন না। এ আয়াতে স্পষ্ট আল্লাহ্তাআলা আমাদের বলেছেন, অযথা অহংকার দেখিও না। নিজের গাল ফুলিয়ে এবং বিশেষ ভঙ্গিমায় ঘাড় শক্ত করে অহংকারীদের চলাফেরা আল্লাহ্ মোটেই পসন্দ করেন না। অনেকের এটা স্বভাব যে, তারা নিজেদের তুলনায় ছোটদের সামনে অহংকারের সাথে ঘাড় শক্ত করে চলাফেরা করে, অন্যদেরকে অহংকার দেখায়। অথচ তারা তাদের বড়দের সামনে নত হতে হতে মাটিতে মিশে যাচ্ছে বলে মনে হয়। এমন লোকদের মুনাফেকী প্রকাশ পেয়ে যায়। সুতরাং এ অহংকার আরো অনেক চারিত্রিক দুর্বলতার কারণ হতে থাকে। তাদের পুণ্যের পথ আস্তে আস্তে বন্ধ হতে থাকে এবং তারা ধর্মের থেকে দূরে সরতে থাকে। জামাতের নেযাম থেকেও দূর হতে থাকে। অহংকার যত বাড়তে থাকে সে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর নিকট থেকে, আল্লাহ্র ফযল থেকে দূর হতে থাকে।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের মাঝে আমার সবচেয়ে প্রিয় হবে, আমার সবচেয়ে কাছে হবে তারা যাদের চরিত্র সবচেয়ে ভাল হবে। সেদিন আমার সবচেয়ে অপ্রিয়, আমার থেকে সবচেয়ে দূরে হবে তারা যারা বাচাল, যারা বার বার খুব সামনে এগিয়ে খুব বেশি কথা বলে, তারা বাড়াবাড়ি করে কথা বলে এবং নিজের আমিত্ব প্রকাশ করে। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চেয়েছেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে যে, ছার ছার ও মুতাসাদ্দেক এর অর্থ তো বুঝেছি; কিন্তু মুতাফাহিক অর্থ বুঝালাম না। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'অহংকারের সাথে কথা বলে যারা' (তিরমিযী)।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, সকল পাপের মূলে তিনটি জিনিস থাকে। অহংকার থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কারণ অহংকারই শয়তানকে সিজদা করা থেকে হযরত আদমকে বিরত রেখেছিল। দ্বিতীয়ত লোভকে সম্বরণ কর। কারণ হযরত আদম-ও লোভে পড়েই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তৃতীয়ত হিংসা থেকে নিজেকে বাঁচাও। কারণ হিংসার কারণেই হযরত আদমের দু'সন্তানের একজন অপরজনকে হত্যা করেছিল" (কেশরিয়া, বাব হাসাদ)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'যার অন্তরে অতি সামান্য অহংকার রয়েছে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিবেন না। এক ব্যক্তি আবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্। মানুষ চায় তার কাপড় ভাল হোক, জুতাও ভাল হোক এবং তাকে দেখতে সুন্দর দেখাক, আঁ হযরত (সঃ) বললেন, এটি অহংকার নয়।' হুযূর (সঃ) বল্লেন, আল্লাহ্তাআলা সুন্দর; তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন।' অর্থাৎ তিনি সুন্দর লাগাকে পসন্দ করেন। অহংকার প্রকৃতপক্ষে সত্যকে অস্বীকার করা, মানুষকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করা, তাদেরকে ছোট মনে করা এবং তাদের সাথে অসদাচরণ করা" (সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

অপর একটি রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝে পরস্পর তর্ক বেধে ছিল। দোযখ বলেছিল, 'আমার মাঝে বড় বড় অত্যাচারী ও অহংকারীরা প্রবেশ করবে।' বেহেশ্ত বলেছে, 'আমার মাঝে দুর্বল ও গরীবরা প্রবেশ করবে।' একথা শুনে আল্লাহ্ দোযখকে বললেন, 'তুই তো আমার আযাবের প্রতীক! যাকে আমি আযাব দিতে চাই তোর মাধ্যমে আযাব দিয়ে থাকি। বেহেশ্তে বললেন, 'তুই আমার রহমতের প্রতীক। যাকে আমি করুণা করতে চাই তাকে তোর মাধ্যমে করুণা করি। তোদের উভয়ে পুরোপুরি নিজ নিজ অংশ পাবি" (মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত)।

আল্লাহ্ করুন প্রত্যেক আহমদী বিনয়ী নম্র এবং সদাচরণ ও উন্নত চরিত্রের পথ অবলম্বন করুক। আল্লাহ্র কৃপা দৃষ্টি লাভ করুক। আল্লাহ্র বেহেশ্তে প্রবেশ লাভের যোগ্যতা লাভ করুক। প্রত্যেকটি গৃহ অহংকারমুক্ত হোক।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "ইযযত বা সম্মান আল্লাহ্র পোশাক, অহংকার আল্লাহ্র চাদর; তিনি বলেছেন, 'যে কেউ আমার কাছ থেকে এ দুটোকে কেড়ে নিতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দেব" (মুসলিম, কিতাবুল বির্র ওয়াস্ সিলাহ্)।

অহংকার শেষ পর্যন্ত মানুষকে আল্লাহ্তাআলার বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেয়। খোদাতাআলা যখন বলেছেন, শির্ক যে করে তাকে ক্ষমা করবেন না, তখন যে ব্যক্তি নিজেকে খোদার বিপরীতে দাঁড় করায় তাকে কিভাবে ক্ষমা করবেন? অহংকার সেই বস্তু যা বিভিন্ন যুগে ফেরাউন বা সেই জাতীয় লোককে সৃষ্টি করে। ফেরাউন এর পরিণাম কী হয়েছিল তা আপনারা পড়েছেন। সে যুগে কী হয়েছিল তা-ও জানেন। সুতরাং এটি বড় ভয় বা ভীতিপ্রদ অবস্থান। প্রত্যেক আহমদীকে সামান্যতম অহংকার হতেও নিজেকে রক্ষা করা উচিত। কারণ সামান্যতম অহংকারও বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে এর আবরণে আবৃত করে ফেলে। আল্লাহ্তাআলা সতর্ক সংকেত দিয়েছেন সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন, 'অহংকার আমার চাদর আমি সমস্ত সৃষ্টির প্রভু, অহংকার আমার জন্য, তোমরা একে গ্রহণ করেন বিনয় অবলম্বন কর। তোমরা যদি এ সীমালঙ্ঘন করে বেরিয়ে আসতে চাও, তাহলে আযাবে পড়ে যাবে। সরিষা পরিমাণ অহংকারও যদি তোমার মাঝে বিরাজ করে তবে আযাব তোমার জন্য অবধারিত। তবে এর সাথে এ শুভ সংবাদও দেয়া হয়েছে, তোমাদের মাঝে যদি বিন্দু পরিমাণও ঈমান

থাকে তাহলে আমি তোমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা করব। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'যার হৃদয়ে সরিষা বরাবর অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এবং যার মাঝে সরিষা বরাবর ঈমান থাকবে সে আগুনে প্রবেশ করবে না" [ইবনে মাজাহ্, কিতাবে মুকাদ্দমা]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

আমি সত্য সত্যই বলছি, কিয়ামতের দিন শির্কের পরে অহংকারের মত অন্য কোন বিপদ থাকবে না। এ তো এমন এক বিপদ যা ইহকাল ও পরকালে মানুষকে অপদস্থ করে দিবে। একত্ববাদে (তৌহীদে) বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্তাআলার কৃপা-দৃষ্টি থাকে কিন্তু অহংকারীদের প্রতি তা থাকে না। শয়তান তো নিজকে তৌহীদী বলে দাবী করত; কিন্তু তার মাঝে অহংকার ছিল। হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্র দৃষ্টিতে প্রিয় বান্দা ছিলেন। যখন শয়তান তাঁকে তুচ্ছ -তাচ্ছিলের দৃষ্টিতে দেখল এবং তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করল তখন সে ধ্বংসের পথে চলে গেল। এবং তার গলায় অভিশাপের বেরি ঝুলিয়ে দেয়া হ'ল। অতএব প্রথম পাপ যা এক ব্যক্তিকে চিরতরে ধ্বংস করে দিল তা ছিল অহংকার (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড; ৫৯৮ পৃঃ)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"তোমাদের মাঝে যদি কোথাও অহংকার অথবা লোক দেখানো অথবা আত্মম্ভরিতা অথবা আলস্য থেকে যায় তাহলে তোমরা তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। এমন যেন না হয় যে, তোমরা মাত্র কয়েকটি কথা জেনে নিয়ে নিজেকে ধোঁকা দাও যে, যা কিছু করণীয় আমরা তা করেছি। কেননা, খোদাতাআলা চান যেন তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি তোমাদের কাছ থেকে এক প্রকার মৃত্যু চান, এরপর তিনি তোমাদেরকে এক নতুন জীবন দিবেন" (কিশ্তিয়ে নূহ্, রূহানী খাযায়েন; ১৯তম খন্ড. ১২-১৩ পৃঃ)।

অন্য এক স্থানে হযরত (আঃ) বলেছেন ঃ এমন অনেক লোক আছে, "যারা নবীগণের তুলনায় হাজার দরজা নিচে, কিন্তু তারা দু'দিন নামায পড়েই অহংকার করতে শুরু করে। অনুরূপভাবে রোযা বা হজ্জ পালনের পরে আত্মশুদ্ধি না হয়ে তাদের মাঝে অহংকার এবং লোক দেখানোর আগ্রহ প্রকাশ পায়। স্বরণ রাখ,অহংকার শয়তানের কাছ থেকে আসে। মানুষ যদি তার থেকে দূরে সরে না যায় তাহলে তাকে শয়তান বানিয়ে দেয়। এটা মানুষকে সত্য গ্রহণে এবং আল্লাহ্র রহমতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কোনভাবেই অহংকার করা উচিত নয়, জ্ঞানের কারণে, সম্পদের কারণে, প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে, বংশগত কারণে, উচ্চ বংশীয় হওয়ার কারণে, অভিজাত হওয়ার কারণে, কোন কারণেই নয়। এসব কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অহংকার সৃষ্টি হয়। মানুষ যতক্ষণ সেসব কারণে আত্মম্ভরিতা থেকে নিজেকে মুক্ত না করবে, ততক্ষণ সে আল্লাহ্র নিকটে বুযুর্গী লাভ করতে পারে না। এমন মা'রেফত (ঐশী-তত্ত্ব) যদ্বারা মানুষের অভ্যন্তরীণ মন্দ উত্তেজনাকে নিরসন করা যায় তা তাকে প্রদান করা হয় না। কারণ ওটা তো শয়তানের অংশ (অহংকার), যা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। ..."

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "কোন কোন বিষয় মৌলিক হয়ে থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। সেসব দিক থেকে নিজেকে রক্ষা কর। অনেকে দু'চার দিন নামায পড়েই নিজেকে পুণ্যবান ভাবতে শুরু করে। তাদের চেহারায় আশ্চর্য রকম গাম্ভীর্য এবং অহমিকা প্রকাশ পায়। অনেক সময় আপনারা দেখেছেন, জুব্বা (লম্বা জামা) পরিহিত, হাতে তসবীহ্ দানা, মসজিদ হতে বের হচ্ছেন, তাদের ঘাড়ে গৌরব ও অহংকার দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ্র হাজার শোকর যে, আহমদীয়া জামাতে এমন জুব্বা ধারীদের স্থান নেই। আবার দেখা যায়, হজ্জ করে এসেছেন একজন, খুব প্রচার করা হচ্ছে যে, অমুক হজ্জ করে এসেছেন। এত বেশি প্রচার, যে প্রচারের শেষ নেই। এমন লোকদের রোযাও হয় লোক দেখানোর জন্য, হজ্জও হয় লোক দেখাবার জন্য। কেবল নিজের বড়াই প্রকাশের জন্য। লোকে যেন বলে যে, অমুক ব্যক্তি বড় নেক অনেক রোযা রাখেন, হজ্জ করে এসেছেন, খুব নেক ব্যক্তি। এসব লোক দেখানো কাজ অহংকারের কারণে সৃষ্টি হয়। অযথা লোক দেখাতে গিয়ে অহংকার সৃষ্টি হয়।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন, "অনেকে নিজের অভিজাত্যের অহংকার করে যে, আমরা উচ্চ বংশীয়। অনেক ব্যক্তি তো নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। আমাদের সাথে তার তুলনা কি করে হয়।" অতএব হযরত আকদস (আঃ)-এর মতে অহংকার অনেক রকম হয় যা তোমাদেরকে আল্লাহ্র মা'রেফত (ঐশী-জ্ঞান) হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর নৈকট্য হতে দূরে নিয়ে যায়। তারপর আস্তে আস্তে মানুষ শয়তানের আওতায় চলে যায়।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "সুতরাং আমার মতে মানুষের পবিত্রতা অর্জনের এটি উত্তম পথ, এর চেয়ে ভাল আর কোন পথ নেই যে, সে অহংকার বা আত্মম্ভরিতা করে না; -না জ্ঞানী হওয়ার, না বংশমর্যাদার না ধন-সম্পদের। আল্লাহ্ যখন কাউকে চক্ষু প্রদান করেন তখন সে দেখে নেয় যে, প্রত্যেক আলো যা অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে পারে তা আকাশ থেকে আসে এবং মানুষ সব সময় ঐশী আলোর অভাব বোধ করে। বাহ্যিক চোখ দিয়েও মানুষ দেখে না যতক্ষণ সূর্যের আলো আকাশ থেকে না আসে। অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক আলো যা হৃদয়ের সকল প্রকার অন্ধকার দূর করে এবং তার বদলে তাকওয়া ও তাহারত (পবিত্রতা)-এর নূর সৃষ্টি করে- তা-ও আকাশ থেকেই আসে। আমি সত্যি সত্যি বলছি, মানুষের তাকওয়াহ্, ঈমান, ইবাদত, তাহারত এ সবই আকাশ থেকে আসে এবং সেটাও আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, তিনি ইচ্ছা করলে আসে নতুবা আসে না।"

সুতরাং মা'রেফত এরই নাম যে, মানুষ নিজেকে ধৃত বা অধিকৃত এবং অতি নগণ্য মনে করে আল্লাহ্র আস্তানায় ফেলে দিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র ফযল ও করুণা ভিক্ষা করবে এবং মা'রেফতের সেই নূর প্রার্থনা করবে যা মানুষের নফসের (আত্মার) উত্তেজনা (পার্থিব মোহ্)-কে জ্বালিয়ে দেয় এবং অন্তরে একটি আলো

এবং পুণ্য অর্জনের শক্তি এবং উত্তাপ সৃষ্টি করে। এরপর আল্লাহ্‌র কৃপায় সে যদি সেই নূরের অংশ লাভ করে এবং পরবর্তীতে নিজ অন্তরে প্রশান্তি ও তৃপ্তি (ঈমানে যখন বুক ভরে যায়) অনুভব করে তাহলে সে যেন এর উপর অহংকার ও গৌরববোধ না করে। বরং তার অনুনয়-বিনয় যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কারণ সে যত বেশি নিজকে তুচ্ছ ও অপদার্থ মনে করবে তত বেশি রূহানীয়ত ও ঐশী নূরসমূহ নাযেল হতে থাকবে, যা তাকে আলো ও শক্তি দান করবে। মানুষ এ ধর্ম-বিশ্বাসটিকে যদি ধারণ করতে পারে তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্‌র ফযলে তার চরিত্র খুবই উন্নত হয়ে যাবে। এ পৃথিবীতে নিজেকে কিছু মনে করাটাই অহংকার এবং এভাবেই মানুষ অহংকারী হয়। এরপর তার অবস্থা এমন হয় যে, সে অন্যকে অভিশাপ দেয় এবং ছোট মনে করে" [মলফূযাত, ৪র্থ খন্ড, ২১৩ পৃঃ]।

অন্য একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "অহংকার বড়ই ভয়ংকর রোগ, যার মাঝে এটি সংক্রামিত হয় তার জন্য এটি রূহানী মৃত্যু। আমি নিশ্চিত জানি যে, এ রোগ খুন বা হত্যার চেয়েও বড়। অহংকারী শয়তানের ভাই হয়ে যায়। এজন্য যে, এ অহংকারই তো শয়তানকে অপসন্দ ও অপমানিত করেছিল। তাই মু'মিনের জন্য এটি শর্ত যে, তার মাঝে যেন অহংকার না থাকে। বরং বিনয়, নতি-স্বীকার ও আত্মনিবেদন যেন তার মাঝে পাওয়া যায়। এটি প্রত্যাদিষ্টদের বিশেষ গুণ। তাঁদের মাঝে এটি পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাঝে এটি সবচেয়ে বেশি ছিল। আঁ হযরত (সঃ)-এর একজন সেবককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তোমার সাথে তাঁর আচার-ব্যবহার কেমন? তিনি খুবই সত্য কথা বলেছিলেন, "আমি তাঁর জন্য কিছু করি না তিনিই (সঃ) তো আমার খেদমত করেন।"

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম" [মলফূযাত; ৪র্থ খন্ড; ৪৩৭ পৃঃ]।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-তার মূল্যবান গ্রন্থ নূযুলে মসীহ্-তে লিখেছেন ঃ

"আমি আমার জামাতকে নসীহত করছি, অহংকার হতে নিজেকে রক্ষা কর। কারণ এটি আমাদের খোদায়ে জুল জালালের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা হয়ত বুঝতে পার না যে, অহংকার কী? অতএব আমার থেকে বুঝে নাও (অহংকার কী?)। আমি খোদার রূহ (রূহুল কুদুস) থেকে বলছি। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজের এক ভাইকে এজন্য নিচ মনে করে যে, সে তার চেয়ে জ্ঞান-বুদ্ধি অথবা কোন প্রযুক্তি বিদ্যায় বেশি বিদ্বান, সে অহংকারী কারণ সে আল্লাহ্‌তাআলাকে বিদ্যা-বুদ্ধির উৎস মনে করে না এবং নিজেকে কিছু একটা মনে করে। অথচ আল্লাহ্‌তাআলা কি তাকে উন্মাদ করে দিতে পারেন না, এবং তার ভাই যাকে সে হেয় মনে করে তাকে তার চেয়ে বেশি বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে দিতে পারেন? অনুরূপ এমন ব্যক্তি যে নিজের ধন-সম্পদ প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা মনে করে কোন ভাইকে হেয় মনে করে সে-ও অহংকারী। কারণ সে এ কথাকে ভুলে গেছে যে, আল্লাহ্‌তাআলাই তাকে এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়েছেন এবং সে অন্ধ হয়ে গেছে, সে জানেনা যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাকে এমন বিপদে ফেলতে পারেন যে, দেখতে দেখতে সে মুহূর্তে সবচেয়ে নিচে গিয়ে পড়বে? এবং তার সেই ভাইকে যাকে সে হেয় মনে করছিল তাকে তার চেয়ে উত্তম ধন-দৌলত দিতে পারেন। এমন সেই ব্যক্তি যে নিজের সুস্থ সবল দেহের কারণে অহংকার করে অথবা নিজের দৈহিক সৌন্দর্য এবং শারীরিক শক্তির কারণে গর্ব করে এবং নিজ ভাইকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং তাকে মন্দ নামে ডাকে এবং তার শারীরিক ত্রুটি বা দুর্বলতার কথা মানুষকে শোনায়, সে-ও অহংকারী এবং সে আল্লাহ্‌র সম্পর্কে অবগত নয় যে, তিনি চোখের পলকে তার দেহের উপর এমন বিপদ নাযেল করতে পারেন যে, শারীরিক দিক থেকে তার সেই ভাইয়ের চেয়েও তার অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে এবং যাকে সে তুচ্ছ মনে করেছিল তার প্রতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত রহমত ও বরকত নাযেল করতে পারেন যেন সে ছোট হয়ে না যায় এবং ব্যর্থ হয়ে না যায়। কারণ তিনি যা খুশী করতে পারেন। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তি, যে নিজ শক্তির উপর ভরসা করে দোয়া প্রার্থনা করতে অলসতা করে সে-ও অহংকারী। কারণ সে আসলে শক্তির এবং ক্ষমতার উৎসকে আবিষ্কার করেনি এবং নিজেকে কিছু একটা ভেবেছে। সুতরাং হে আমার প্রিয়-জনেরা! এসব কথাকে স্মরণ রাখ, এমন যেন না হয় যে, কোনভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অহংকারী বলে গণ্য হও এবং তোমরা এ সম্পর্কে বে-খবরই থেকে যাও। এক ব্যক্তি যে তার ভাইয়ের ব্যবহার করা ভুল শব্দের সংশোধন করে অহংকারের সাথে সে-ও অহংকারে অংশ নিয়েছে। যে নিজ ভাইয়ের কথা বিনয়ের সাথে মনযোগ দিয়ে শুনতে চায় না এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় সে-ও অহংকারে অংশ নিয়েছে। একজন গরীব ভাই তার কাছে বসেছে বলে সে তাকে অপসন্দ করছে, অতএব সে-ও অহংকারে অংশ গ্রহণ করেছে। একজন খুব দোয়া করে বলে তাকে আর একজন ঠাট্টা করে মজাক করে, অতএব সে-ও অহংকারে অংশ নিয়েছে। এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত মা'মুরের পুরোপুরি আনুগত্য করতে চায় না, সে-ও অহংকারে অংশ গ্রহণ করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রেরিত মা'মুরের কথাবার্তাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না এবং তাঁর লেখাও মনোযোগ দিয়ে পড়ে না সে-ও অহংকারে অংশ গ্রহণ করেছে। সুতরাং তোমরা চেষ্টা কর যেন অহংকারের কোন সামান্য অংশও তোমাদের মাঝে না থাকে যেন তোমরা ধ্বংস হয়ে না যাও এবং পরিবার-পরিজনসহ মুক্তি পাও। তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড় এবং যে পরিমাণ ভালবাসা পৃথিবীতে কারো সাথে করা সম্ভব সে পরিমাণ ভালবাসা তাঁর সাথে কর এবং পৃথিবীতে কোন মানুষকে যতটা ভয় পেতে পার ততটা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তুমি পবিত্র হৃদয় হয়ে যাও; পবিত্র নিয়্যত হয়ে যাও, গরীব, মিসকীন ও নিষ্কন্টক হয়ে যাও যেন তোমার প্রতি দয়া করা হয়" [নূযুলে মসীহ্; রূহানী খাযায়েন, ১৮ খন্ড, ৪০২ পৃঃ]।

তারপর বয়াতের শর্তে আছে যে,

"দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করব।"

আমি যেমন এখনই বলেছি, যখন আপনারা অন্তরকে অহংকার মুক্ত করতে চেষ্টা করবেন, অহংকার মুক্ত করবেন, তখন নিশ্চয় একটি বড় চারিত্রিক গুণ আপনার মাঝে সৃষ্টি করতে

হবে। নতুবা শয়তান আবার আপনার উপর আক্রমণ করবে। কারণ সে এ কাজের জন্যই বসে আছে। সে আপনার পিছু ছাড়বে না। সুতরাং সেই চারিত্রিক গুণ হচ্ছে বিনয় এবং গরীবের মত নম্রতা। এটা হতে পারে না যে, বিনয় ও অহংকার একত্রে থাকবে। অহংকারীরা তো সকল যুগে বিনয়ী মানুষ, 'এবাদুর রহমান'দের প্রতি হাসি-ঠাট্টা মজাক করেই আসছে। বাক্য-বাণ চালিয়েই আসছে। কথা শুনিয়েই আসছে। অতএব এমন লোকদের বিপরীতে আপনারা অমন করতে পারেন না। বরং আল্লাহ্‌র আদেশ মানতে হবে" (সূরা ফুরকান আয়াত ঃ ৬৪)

অনুবাদ ঃ এবং রহমান খোদার প্রকৃত বান্দা তারাই, যারা ভূপৃষ্ঠে নম্র হয়ে হাঁটে-চলে এবং অজ্ঞরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা (কোন বিবাদ না করে) বলে 'সালাম'।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র খাতিরে এক মাত্রা পরিমাণ বিনয় অবলম্বন করেছে আল্লাহ্ তাকে এক মাত্রা (রূহানী) উন্নতি দিবেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত সে ইল্লীয়ীন (অতি উচ্চ মোকাম) পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যে ব্যক্তি এক মাত্রা অহংকার দেখিয়েছে আল্লাহ্ তাকে এক মাত্রা নিচে ফেলে দিবেন। এভাবে সে শেষ পর্যন্ত আস্‌ফালুস্ সাফেলীনে পতিত হবে" (মুসনাদ আহমদ)।

অপর এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ

"সদকা-খয়রাত করলে সম্পদ কম হয় না; আল্লাহ্‌র বান্দা যত বেশি অন্যদেরকে ক্ষমা করে আল্লাহ্ তাকে তত বেশি ইয্যত দান করেন। যত বেশি কেউ বিনয় ও নিরহংকার হতে থাকে আল্লাহ্ তাকে তত বেশি উচ্চ মর্যাদা দিতে থাকেন' (মুসলিম কিতাবুল্ বির্‌র ওয়াস্ সিলাহ্)।

আয়ায বিন হেমার বিন মজাশেয়ের ভাই রেওয়ায়াত করেছেন, আমাদের সামনে আঁ হযরত (সঃ) বক্তব্য রাখলেন। হুযূর (সঃ) বললেন, "আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে ওহী করেছেন, 'তোমরা এতটা বিনয়ী হও যে কেউ কাউকে অহংকার দেখিও না এবং একে অপরের উপর অত্যাচার কর না।"

আর একটি হাদীস আছে, আমাদের পরস্পরের মধ্যকার বিষয়াদিতে স্মরণ রাখা দরকার। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র পথে খরচ করাতে সম্পদ কম হয় না এবং কোন বক্তি যত বেশি ক্ষমা করে আল্লাহ্ তত বেশি তার সম্মান বৃদ্ধি করেন। যত বেশি কেউ বিনয়াবনত হয় আল্লাহ্ তত বেশি তার পদমর্যাদার উন্নতি দান করেন" (মুসলিম, কিতাবুল বির্‌র ওয়াস্ সিলাহ্)।

প্রত্যেক আহমদী একে অপরকে ক্ষমা করতে অভ্যাস করবেন। পরকালেরও মর্যাদা বৃদ্ধি হতে থাকবে এবং ইহকালেও আল্লাহ্‌তাআলা ইয্যত দিবেন। আল্লাহ্‌তাআলার জন্য কেউ কিছু করলে সে বিনা পুরস্কারে থাকে না।

অসহায় গরীবদের সম্মান আঁ হযরত (সঃ)-এর নজরে কতটুকু তা জানা যায় এ হাদীস থেকে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ)-কে দোয়া করতে আমি শুনেছি যে, 'হে আল্লাহ্ আমাকে গরীব হয়েই জীবন যাপন করতে দাও এবং গরীব অবস্থাতেই মৃত্যু দাও এবং গরীবদের দলের মাঝ দিয়েই পুনরুত্থান করাও" (ইবনে মাজাহ্, কিতাবুয্ যুহদ)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"খোদাতাআলাকে যদি খুঁজে পেতে চাও তাহলে গরীব-মিসকীনদের অন্তরের পাশে খুঁজে দেখ। এ জন্যই তো নবী (সঃ) মিসকীন গরীবদের পোশাক পরে নিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বড় জাতের লোকেরা যেন ছোট জাতের লোকদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। আর কেউ যেন না বলে, আমরা উচ্চ বংশীয়।' আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, তোমরা যখন আমার কাছে আসবে, আমি তোমার বংশ কি তা জিজ্ঞেস করব না। বরং জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার কার্যাবলী কি ছিল? আবার আঁ হযরত (সঃ) নিজ কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'হে ফাতেমা! আল্লাহ্ তোমার বংশ কি তা জানতে চাইবেন না। তুমি যদি কোন অন্যায় কর, আল্লাহ্ তোমাকে রসূলের (সঃ) কন্যা বলে ক্ষমা করবেন না। সুতরাং তুমি সদাসর্বদা তোমার কাজ দেখে-শুনে করবে' (মলফূযাত, খন্ড ৩, পৃঃ ৩৭০)।

অন্য এক বক্তৃতায় হযরত (আঃ) বলেছেন ঃ "তাকওয়াহ্ অবলম্বনকারীদের জন্য এটি শর্ত ছিল যে, তারা দরিদ্রতা ও গরীবি অবস্থায় জীবন যাপন করবে। এটি তাকওয়ার একটি শাখা যদ্বারা অযথা ক্রোধকে দাবানো সম্ভব। আল্লাহ্‌র পথের বড় বড় পথিকদের জন্য শেষ এবং কঠিন স্তর হচ্ছে ক্রোধকে সম্বরণ করা। স্বেচ্ছাচারিতা ও অনাচার ক্রোধ থেকে জন্ম নেয়। কারণ ক্রোধ তখনই হবে যখন মানুষ নিজেকে অন্যের উপর প্রাধান্য দিবে" [রিপোর্ট সালানা জলসা, ১৮৯৭ইং পৃঃ ৪৯)।

কিশতিয়ে নূহ এ হযরত (আঃ) লিখেছেন ঃ

"তোমরা যদি চাও যে, আকাশে খোদাতাআলা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাহলে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হয়ে যাও। তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই অধিক মহৎ যে নিজের ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করে এবং নিজ ভাইকে ক্ষমা করে না। অতএব এমন ব্যক্তির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই" [আমাদের শিক্ষা ঃ ০৮ পৃঃ)।

বয়াতের ৮ম শর্তটি নিম্নরূপ ঃ

"ধর্মের ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্মান, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।"

"ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদির উপরে অগ্রাধিকার করব"– এটি এমন একটি প্রতিজ্ঞা যা এ জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি যে জামাতের সাথে যথারীতি সম্পর্ক রাখে, প্রত্যেক জলসা বা সাধারণ সভায় যোগ দেয়, সে এ প্রতিজ্ঞাকে বার বার উচ্চারণ করে। প্রত্যেক ইজতেমা এবং প্রত্যেক জলসায় যেসব ব্যানার ইত্যাদিতে লেখা হয় তাতে অনেক ক্ষেত্রে এ প্রতিজ্ঞাটি দেখা যায়। এ কথাটিকে এত বেশি গুরুত্ব কেন দেয়া হয়েছে? এজন্য এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, এ ছাড়া ঈমান কায়েম রাখা সম্ভব হয় না। এর উপর আমল করা কোন সহজ ব্যাপার নয়। অতএব এ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সর্বদাই আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য চাইতে থাকা উচিত। কেবল আল্লাহ্‌র ফযলেই এর উপর কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে হযরত মসীহ্ মাওউদ

(আঃ)-এর বয়াতের অন্তর্ভুক্ত আছি। আমাদের জন্য আল্লাহ্‌তাআলা এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ...

অনুবাদ ঃ "এবং আদেরকে এ ছাড়া আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে, ধর্মকে তাঁরই জন্য খাঁটি করে একনিষ্ঠভাবে এবং নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে এবং এটা (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী ধর্ম" (আল্ বাইয়েনাহ্ ঃ ৬)।

সুতরাং নামায প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে অর্থাৎ নামায জামাতে কায়েম করার মাধ্যমে, আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার মাধ্যমে, গরীবদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দেয়ার মাধ্যমে, আমরা সঠিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারি এবং এসব শিক্ষাকে নিজেদের জীবনের অংশ বানাতে পারি। নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। আমরা যখন আল্লাহ্‌র ইবাদত করব, তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আদেশ পালন করব, তখন তিনি আমাদেরকে শক্তি দিবেন, আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করে দিবেন, ফলে আমরা আমাদের নিজ সত্তা, নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের সন্তান আমাদের ধর্মের তুলনায় আমাদের চোখে তুচ্ছ হয়ে যাবে। অতএব যখন সব কিছু প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র হয়ে যাবে এবং আমাদের নিজের বলতে কিছু থাকবে না, তখন আল্লাহ্ এমন লোকদের বিনষ্ট হতে দেন না। তাদের মান-সম্মান রক্ষা করেন, তাদের সন্তানদের রক্ষা করেন, তাদের প্রতি বরকত নাযেল করেন। তাদের সম্পদে বরকত দেন। এবং তাদেরকে নিজ রহমত ও ফযলের চাদর দিয়ে জড়িয়ে রাখেন। তাদের সকল প্রকার ভয়-ভীতি দূরীভূত করে দেন। যেমন বলেছেন ঃ

"না; বরং যে কেউ আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয় সেক্ষেত্রে তার জন্য তার প্রভুর নিকট প্রতিদান রয়েছে। এবং তাদের আর কোন ভয় আসবে না এবং তারা মর্মাহতও হবে না" (সূরা বাকারা ঃ ১১৩)।

আবার বলেছেন ঃ

"এবং ধর্মের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কে উৎকৃষ্টতর হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সে সৎকর্মশীল হয় এবং একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন" (সূরা নিসা ঃ ১২৬)।

এ আয়াতে ইসলামী শিক্ষাসমূহের সারাংশ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহকে কাজে পরিণত করা; তাঁর ধর্মের খাতিরে নিজেকে উৎসর্গ করা এবং সৎকর্মশীল ও দায়িত্ববান হওয়া। যেহেতু সে আল্লাহ্‌র খাতিরে সৎকর্মশীল হবে, সুতরাং কারো একথা মনে করা উচিত নয় যে, সদা-সর্বদা সে ধর্মের সেবা করছে।

তাই তার সম্পদ বা সন্তানাদি নষ্ট হয়ে যাবে না। বরং আল্লাহ্‌তাআলা সবচেয়ে উত্তম প্রতিদানকারী ও পুরস্কার দানকারী-, তিনি তার এমন কাজের পুরস্কার নিজেই দিবেন। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, তিনি নিজেই এমন ব্যক্তির জান-মাল, ইয্যতকে রক্ষা করবেন। এমন লোকদের বংশধরদের আল্লাহ্ কখনও নষ্ট হতে দিবেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, (সূরা বাকারার ১১৩ আয়াত) "অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে খোদার সামনে রেখে দেয় এবং নিজের জীবন আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করে দেয় এবং পুণ্যকর্মে ব্যস্ত হয়ে থাকে সে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নিজের পুরস্কার পাবে। এবং এমন লোকদের কোন ভয় নেই, কোন দুঃখ নেই।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত শক্তিকে আল্লাহ্‌র পথে লাগিয়ে দেয় এবং তার সমস্ত জীবন, তার চলাফেরা, তার কথা-বার্তা, উঠা-বসা আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায় এবং প্রকৃতপক্ষে পুণ্য কর্মে ব্যস্ত থাকে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ নিজ থেকে পুরস্কার দিবেন। এবং ভয় ও দুঃখ থেকে বাঁচাবেন।" [খৃষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর; রূহানী খাযায়েন, ১২ খন্ড; ৩৪৪ পৃঃ)।

একটি হাদীসে আছে, হযরত মুয়াবিয়া বিন হায়দাহ্ কুশায়রী (রাঃ) তাঁর নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বলেছেন এই যে, 'আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলাম, আপনাকে আপনার প্রভু কী শিক্ষা দিয়েছেন, কী ধর্ম দিয়েছেন? হুযূর (সঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ আমাকে ইসলাম ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন।' আমি জানতে চাইলাম, ইসলাম কী? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'ইসলাম এই যে, তুমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করে দাও এবং অন্য সমস্ত উপাস্য বা পূজনীয়দের সাথে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন কর, নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর" (ইস্তিয়াব)।

আর একটি রেওয়ায়াত হযরত সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আমি একবার আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে আরয করেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কথা বলুন- যার ফলে এরপরে আর কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেসের প্রয়োজন না থাকে। এবং আমার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ হয়ে যায়। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, "তুমি বল যে, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি। পরে এর উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম হয়ে যাও এবং অবিচল থাক।"

সাহাবায়ে কেরামের আমল কী রকম ছিল? হাদীসে আছে, প্রথম যুগে মদ তখনও হারাম হয়নি। সাহাবা মদ পান করতেন। অনেক সময় নেশাগ্রস্ত হতেন। কিন্তু নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেও ধর্মের সম্মানকে ভুলে যেতেন না। সকল অবস্থায় তারা ধর্মকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিতেন। যে সময় মদ হারামের নির্দেশ আসল সে সময় এক মজলিসে সাহাবা মদ পান করছিলেন। কেউ কেউ নেশাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু মদ হারাম হয়ে যাবার আদেশ শোনা মাত্র আদেশ পালন করেছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি আবূ তালহা আনসারী, আবূ ওবাইদাহ্ বিন জার্‌রাহ্ এবং ওবাই বিন কা'বকে খেজুরের মদ পান করাচ্ছিলাম। কোন ব্যক্তির (ঘোষণার) কণ্ঠ ধ্বনি শুনলাম যে, মদ হারাম করা হয়েছে। একথা শুনে আবূ তালহা বললেন, 'আনাস! উঠ, মদের কলস ভেঙ্গে দাও।' হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি উঠে মদের কলসীর উপর পাথর মারলাম এবং কলসী ভেঙ্গে গেল' [বুখারী; কিতাব খাবরুল ওয়াহেদ]।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"ইসলামের পুনর্জীবন লাভ আমাদের কাছে একটি প্রায়শ্চিত্ত চাচ্ছে। সেটি কী? এ পথে

আমাদের মৃত্যুবরণ করা। এ মৃত্যু যার উপর ইসলামের জীবন লাভ; মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার জ্যোতির বিকাশ নির্ভর করছে। এটাই সেই জিনিস যার অপর নাম ইসলাম। এ ইসলামকে আল্লাহ্ এখন জীবিত করতে চান। সুতরাং এ মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য, এ বিশাল কর্মকান্ডকে সঠিকভাবে চালাবার জন্য খুবই জরুরী ছিল একটি সুবিশাল কারখানার, যা সকল দিক থেকে সক্রিয় এবং তিনি নিজ থেকে তা প্রতিষ্ঠা করতেন। অতএব সেই হাকীম ও কাদীর খোদাতাআলা আমাকে মানব জাতির সংশোধনের জন্য পাঠিয়ে তা করেছেন।" [ফতেহ্ ইসলাম; রূহানী খাযায়েন, ৩ খন্ড; ১০ পৃঃ]।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সততা ও পবিত্রতার সাথে আল্লাহ্র বান্দা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন স্থান লাভ করা কঠিন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন ঃ **ওয়া ইব্রাহীমাল্লাযী ওয়াফ্ফা** (সূরা নজম; ৩৮) অর্থ ঃ ইব্রাহীম সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করেছে। সুতরাং এভাবে নিজ অন্তরকে (খোদা ছাড়া) অন্যদের কাছে থেকে পবিত্র করতে হবে, আল্লাহ্র ভালবাসায় পরিপূর্ণ করতে হবে, আল্লাহ্তাআলার ইচ্ছামত জীবন যাপন করতে হবে যেমন ছায়া তার আসলের অনুসরণ করে। তেমনই তাঁর (আল্লাহ্র) অনুগত হতে হবে। খোদার ইচ্ছা ও বান্দার ইচ্ছার মাঝে যেন পার্থক্য বাকী না থাকে।

এ সমস্ত কথা দোয়ার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। নামায তো মূলত দোয়ার জন্যই পড়তে হয়। প্রত্যেক অবস্থানে থেকে দোয়া করতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় নামায আদায় করে, সে জানেই না [যে, সে কী করছে) তাহলে তো এটা নামায নয়। ... সুতরাং নামায আদায় করতে মানুষ যেন অলসতা না দেখায় আর না অবহেলা করে। আমাদের জামাত যদি জামাত হতে চায় তবে-একে এক প্রকার মৃত্যুবরণ করতে হবে। নিজের নফসের (আমিত্বের) বিষয়ে এবং নফসের দাবীসমূহ থেকে বাঁচতে হবে এবং সব কিছুর উপর আল্লাহ্কে প্রাধান্য দিতে হবে" (মলফূযাত; ৩ খন্ড; ৪৫৭ পৃঃ)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কিশ্তিয়ে নূহ্ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"হে খোদান্বেষী বান্দাগণ! কর্ণ উন্মুক্ত করিয়া শ্রবণ কর, একীনের (দৃঢ় বিশ্বাসের) সদৃশ কোন বস্তু নাই। একমাত্র 'একীন'ই মানুষকে পাপকার্য হইতে বিরত রাখে, 'একীন'ই মানুষকে পুণ্যকর্ম সাধন করিবার শক্তি প্রদান করে। একমাত্র 'একীন'ই মানুষকে খোদাতাআলার আশেকে-সাদেক বা খাঁটি প্রেমিক করে। 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা পাপ বর্জন করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন শান্তি লাভ করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন সত্যিকারের সুখ লাভ করিতে পার? আকাশের নিম্নে কি এমন কোন 'কাফ্ফারা' (Atonement বা প্রায়শ্চিত) এবং এমন কোন 'ফিদিয়া' (বদলা) আছে, যাহা তোমাদিগকে পাপ বর্জন করাইতে পারে? মরিয়মের পুত্র ঈসার কল্পিত রক্ত কি তোমাদিগকে পাপ-কর্ম হইতে পরিত্রাণ দিবে? ...

অতএব স্মরণ রাখিও যে, 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা অন্ধকারপূর্ণ জীবন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না এবং 'রূহুল কুদুস' বা পবিত্রাত্মাও তোমরা লাভ করিতে পারিবে না। 'মোবারক' (ভাগ্যবান) সেই ব্যক্তি যে 'একীন' লাভ করিয়াছে, কারণ সে-ই খোদাতাআলার দর্শন লাভ করিবে। 'মোবারক' সেই ব্যক্তি যে সকল সংশয় ও সন্দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, কারণ সে-ই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। 'মোবারক' তোমরা, যখন তোমাদিগকে 'একীনের' সম্পদ দেওয়া হয়, কারণ, উহার ফলে তোমাদের গোনাহ্ বা পাপের অবসান হইবে। 'গোনাহ্' ও 'একীন' এই দুইটি একত্র হইতে পারে না। তোমরা কি সেই গর্তে হস্ত প্রবিষ্ট করিতে পার, যাহার ভিতরে তোমরা এক বিষাক্ত সর্প দেখিতেছ? তোমরা কি এরূপস্থলে দন্ডায়মান থাকিতে পার যেখানে কোন আগ্নেয়গিরি হইতে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়, কিংবা বজ্রপাত হয়, অথবা যেখানে এক রক্ত পিপাসু ব্যাঘ্রের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, বা যেখানে এক ধ্বংসকারী প্লেগ মানুষের বংশ নিপাত করিতেছে? সুতরাং খোদাতাআলার প্রতি যদি তোমাদের ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস থাকে, যেরূপ বিশ্বাস সর্প, বজ্র, ব্যাঘ্র বা প্লেগের প্রতি আছে, তবে ইহা সম্ভবপর নহে যে, তোমরা খোদাতাআলার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শাস্তির পথ অবলম্বন করিতে পার, কিংবা তাঁহার সহিত তোমরা সরলতা ও বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পার" [আমাদের শিক্ষা; (কিশ্তিয়ে নূহ) পৃঃ ৩১-৩২]।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লাহোর শহরের একটি বক্তৃতায় বলেছেন ঃ

"ভয়, ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কামেল মা'রেফতের (পরিপূর্ণ রূহানী-তত্ত্ব) মূল গোড়া। সুতরাং যাকে সম্পূর্ণ মা'রেফত দান করা হয়েছে তাকে ভয় এবং ভালবাসা-ও পুরো মাত্রায় দান করা হয়েছে। যাকে ভয় এবং ভালবাসা প্রদান করা হয়েছে তাকে প্রত্যেক পাপ থেকে মুক্তি দান করা হয় যা বে-আদবী হতে জন্ম নেয়। অতএব এ মুক্তির জন্য আমরা কোন রক্তপাত বা ক্রুশের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন বোধ করি না। বরং আমরা কেবল একটি ত্যাগ বা কুরবানীর প্রয়োজন বোধ করি। আর তা হ'ল নিজ নাফসের (নিজ সত্তা / আমিত্ব) কুরবানী। এ প্রয়োজন এমন যা আমাদের প্রকৃতিতে অনুভূত হয়। এমন কুরবানীর অপর নাম ইসলাম। ইসলাম অর্থ জবাই হবার জন্য মাথা নত করা বা ঘাড়কে পেতে দেয়া। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সম্মতির সাথে নিজের প্রাণকে আল্লাহ্র দরবারে রেখে দেয়া। এ প্রিয় নামটি (ইসলাম) শরীয়তের মুল এবং সকল নির্দেশসমূহের প্রাণস্বরূপ।

জবাই হবার জন্য আন্তরিকভাবে খুশীর সাথে নিজ ইচ্ছায় নিজের ঘাড় এগিয়ে দেয়ার জন্য পরিপূর্ণ ভালবাসা এবং পরিপূর্ণ প্রেমের প্রয়োজন। এবং পরিপূর্ণ ভালবাসার জন্য পরিপূর্ণ মা'রেফতের (ঐশী-জ্ঞান) প্রয়োজন। সুতরাং ইসলাম শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, প্রকৃত কুরবানীর (ত্যাগ) জন্য পরিপূর্ণ মা'রেফতের এবং পরিপূর্ণ ভালবাসার প্রয়োজন। আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই' (লেকচার লাহোর, পৃঃ ৮-৯)।

আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এসব কথার উপর আমল করার তৌফীক দান করুন।

[আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ২৪ অক্টোবর, ২০০৩ইং]

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আল্লাহ্‌তাআলার 'খবীর' সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ১১ এপ্রিল, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ আজকের জুমুআর খুতবায় আল্লাহ্‌তাআলার সিফত 'খবীর' এর বিবরণ আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্‌তাআলা যতদিন চাইবেন এ বিষয়ে বর্ণনা চলবে।

আল্লাহ্‌র সিফত 'খবীর' সম্পর্কে কতিপয় আয়াত সর্বপ্রথম আপনাদের শোনাচ্ছি। তারপর 'খবীর' শব্দের অর্থ বলব। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখছি, কুরআন শরীফে ৪৪ বার খবীর সিফতের উল্লেখ আছে।

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসাবে যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার এবং স্বজনগণের বিরুদ্ধেই যায়। (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হবে) সে যদি ধনী হয় অথবা দরিদ্র, তাহলে আল্লাহ্ তাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং তোমরা হীন কামনার অনুসরণ করিও না যাতে তোমরা ন্যায়বিচার করতে পার। এবং যদি তোমরা কথা পেঁচাইয়া (সত্যকে) গোপন কর অথবা এড়িয়ে যাও তাহলে (জেনে রাখ) তোমরা যা কিছু কর তদসম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন" (সূরা নিসা ঃ ১৩৬)।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা আনআম ঃ ১৯ ঃ

"বস্তুত তিনি তার বান্দাদের উপর প্রবল (ক্ষমতার অধিকারী) এবং পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ" (সূরা আনআম ঃ ১৯)।

"এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে যথাযথ প্রজ্ঞার সাথে সৃষ্টি করেন, এবং যেদিন তিনি বলবেন, 'হও' তখন তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য; এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন সর্বাধিপত্য একমাত্র তাঁরই হবে। তিনি গুপ্ত ও ব্যক্ত সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত। বস্তুত তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত" (সূরা আনআম ঃ ৭৪)।

'কুন ফাইয়াকুন' অর্থ এই নয় যে, তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। দেখুন, বিশ্ব সৃষ্টির আরম্ভে আল্লাহ্ বলেছিলেন, 'কুন'। এমন তো হয়নি যে সাথে সাথে সবকিছু হয়ে গেছে! বরং অর্থ এই যে, হতে আরম্ভ হয়ে গেছে এবং অবশেষে তা সমাপ্ত হয়েছে। চতুর্থ আয়াত

"দৃষ্টিশক্তি তাঁর নাগাল পেতে পারে না কিন্তু তিনি দৃষ্টিশক্তিগুলোর নাগাল পেয়ে থাকেন, বস্তুত তিনি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম, সম্যক অবহিত" (সূরা আনফাল ঃ ১০৪)।

খবীর শব্দের অর্থ বলছি। তফসীরকারকগণ বড় গভীরে গিয়ে গবেষণা করেছেন। যারা অনেক বেশি অভিজ্ঞ অনেক গবেষণা করেছেন তাদেরকে খবীর বলে। যে কোন জিনিসকে খুব গভীরভাবে জানে তাকে খবীর বলে। যেমন বলা হয়, 'বাদশাহ্ রাজনীতি সম্পর্কে খুব গভীর জ্ঞান রাখেন।'

বলা হয়, 'খবীরুন ফী হানদাসাতেল বানায়ে" - 'সে নির্মাণ কাজের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার।' হাকেম বা বিচারককেও খবীর বলা হয়। কারণ তিনি যে কোন সিদ্ধান্ত দেবার বিষয়ে খুব অভিজ্ঞতা রাখেন, তিনি খুব ভাল জানেন যে, কোন্ বিষয়ে কিভাবে সিদ্ধান্ত দিতে হয়। (মুনজিদ)

আল্লাহ্‌র নাম খবীর। অর্থাৎ তিনি যা হয়েছে এবং যা হবে সব কিছুই জানেন (লিসানুল আরব)। হযরত ইমাম রাগেব লিখেছেন, 'খবীর' অর্থ জানা বস্তুসমূহ সম্পর্কে খুব জ্ঞান রাখেন। সাধারণ সব জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন।

বিষয়টি বড় কঠিন। এ বিষয় এবং এ উদ্ধৃতি যদি পড়ি তাহলে অনেকে বলবেন, খুতবা দীর্ঘ হয়েছে। কিন্তু এতো আবশ্যক। সুতরাং উদ্ধৃতিগুলো কঠিন। মনোযোগসহ বুঝতে হবে।

খবর ঃ খবর এর অর্থ এই যে, জানা-শোনা বিষয়ের খবর সাধারণভাবে জানা। বাহ্যিকভাবে অবহিত হওয়াকে খবীর হওয়া বলা হয়। আবার কোন বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখা, সে বিষয়ে ভেতর বাহির সব কিছু গভীরভাবে জানাকেও খবীর বলা হয়। এমন গভীরভাবে অবগত হওয়াও খবীর হওয়া। আল্লাহ্‌তাআলা সব দিক থেকে খবীর। তিনি সব বিষয়ে সকল দিক থেকে খবীর।

'আল খুবরাতু' বলা হয় কোন জিনিসের ভেতরের বা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে গভীরভাবে অবগত হওয়া। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ওয়াল্লাহু খাবীরুম বিমা তা'মালুন অর্থ ঃ আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে গভীরভাবে এবং এর অভ্যন্তরীণ দিকগুলোও খুব অবহিত আছেন।

খবীর ও মুখ্‌বির এরও সেই অর্থ। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ এবং তিনি তোমাদেরকে খবর দিবেন যে, তোমরা কী কী করেছ (মুফরাদাত)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন ঃ

খবীরুম্ বিমা তা'মালূন ঃ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য এ আয়াত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ সর্বদা সাথে সাথে আছেন, আমাদের সমস্ত কাজ-কাম সম্পর্কে খবর রাখছেন" (হাকায়েকুল ফুরকান, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৮০)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"প্রত্যেক যুগে নতুন নতুন রূহানী তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। দার্শনিকরা নিজের মত করে, কবিরাজরা তাদের মত করে, সুফীয়াকেরাম (বিশুদ্ধচিত্ত পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ) নিজেদের মত করে বর্ণনা করেন। আর সমস্ত বিবরণের খবর হাকিম ও খবীর খোদা রেখেছেন। হাকিম (মহাজ্ঞানী-প্রজ্ঞাবান) তাকে বলা হয় যিনি প্রয়োজনীয় বস্তু বা দ্রব্যসমূহের সম্পর্কে যতটা জানা দরকার ততটা তিনি জানেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান রাখেন। এবং এগুলোর ব্যবহারও এতটা জানেন যে, প্রত্যেককে যথাস্থানে যথাযথভাবে রাখতে পারেন।"

প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া এক কথা, কিন্তু কোন বস্তু সম্পর্কে কখনও কতটুকু বলতে হবে, কোথায় একে রাখতে হবে- এটি পৃথক বিষয়। অতএব কুরআন শরীফে 'খবীর' শব্দ উভয় অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা খবীর আবার তিনি এটাও জানেন যে, একথা কখন কোথায় বলতে হবে। "প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে রাখা।" খবীর

মুবালেগার সিগা অর্থাৎ প্রাচুর্য ও আধিক্যের অর্থ এতে আছে। খবীর অর্থ আল্লাহ্ অনেক বেশি খবর রাখেন। আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতার বাইরে কিছুই নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ কুরআন করীমকে কিতাবে মজীদ বা 'খাতামুল কুতুব' বলা হয়েছে- এ কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। তিনি খুব জানতেন যে, কিভাবে এর শিক্ষাকে মানুষের মাঝে প্রচলিত রাখতে হবে। অতএব তদনুসারেই এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। এরপর যুগে যুগে মুজাদ্দেদীন ও মুসলেহীনের (নবায়ন ও সংস্কারক) আগমন অব্যাহত রেখেছেন। যারা এ কিতাবের ব্যাখ্যা করেন (মলফূযাত; ১ম খন্ড; পৃঃ ৩৪৬)।

আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যখন এ কিতাব নাযেল হয়েছিল তখনই আমাদের খবীর খোদা ভবিষ্যতে যেসব আবিষ্কার হবার কথা ছিল ভবিষ্যৎ কালে ঘটবে এমন বহু ঘটনার বর্ণনাও এ কিতাবে দিয়েছিলেন। আজকের যুগে আমাদের সামনে সেসব ঘটনা বাস্তবে ঘটে যাচ্ছে। ফলে ওসব খবরকে বুঝতে পারছি। এভাবে আঁ হযরত (সঃ) যাঁর উপর কুরআন নাযেল হয়েছিল তাঁর মকাম মর্যাদা ও মহিমা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এর কিছু নমুনা পেশ করছি।

অতীতের খবর, যে খবর আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগে কেউ জানত না। এরপর অতীতের খবরের সাথে ভবিষ্যতের খবরও আছে। হযরত নূহ্ (আঃ) সম্পর্কে প্রথমে বলছি।

"এবং আমরা তাকে তক্তা পেরেক নির্মিত যানবাহনের উপর আরোহণ করিয়েছিলাম। ওটা তোমাদের চোখের সামনে চলছিল। এটা সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিদান ছিল যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল। এবং আমরা এটাকে (পরবর্তীদের জন্য) এক নিদর্শনস্বরূপ রেখেছিলাম। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (সূরা কামার ঃ ১৪-১৬)।

এ আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকার কথা বলা হয়েছে যা ভবিষ্যৎ কালে নিদর্শনস্বরূপ প্রকাশ হবার কথা ছিল। বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন রকম মতামত পেশ করেছেন। কেউ বলেছে, জুদি পাহাড়ে সে নৌকা গিয়ে আটকে পড়েছিল অতএব সেখানেই আছে। অন্যরা অন্য স্থানের কথা বলেছে। আমি এ বিষয়ে অনেকটা গবেষণা করিয়েছি। আমার গবেষণার ফলে আমার মতে সেই নৌকা অবশ্যই সংরক্ষিত আছে। কিন্তু কোন পাহাড়ের উপরে নয় সম্ভবত Dead Sea বা মৃত সাগরের তল দেশে পড়ে আছে। এ সাগরের পানি এত বেশি ঘন যে, এর গভীরে কোন জিনিস যদি তলিয়ে যায় তবে তা চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যায়। সুতরাং আমার গবেষণা বা আমার নিজের মতামত এই যে, সেই নৌকা মৃত সাগর থেকে এক সময় বের করা হবে। আমার পক্ষ থেকে কয়েকজন আহমদী বিজ্ঞানীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।

এবার ফেরাউনের মৃতদেহের কথা বলছি। বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্ ফেরাউনকে বললেন, অতএব আজ আমরা তোমাকে শুধু তোমার দেহ দিয়েই রক্ষা করব, যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য এক নিদর্শন হও। এবং নিশ্চয়ই মানুষের অধিকাংশই তোমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবহিত (সূরা ইউনুস ঃ ৯৩)।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, কুরআন করীম অদৃশ্য খোদার পক্ষ থেকে নাযেল করা হয়েছে। কারণ আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগে তো ফেরাউনের মৃত দেহের কোন ইঙ্গিতও ছিল না। বর্তমান যুগে এসে প্রত্নতত্ত্ববিদরা সেই ফেরাউনের মৃতদেহকে খুঁজে বের করেছেন, যে নাকি হযরত মূসা (আঃ)-এর পিছু নিয়েছিল। এথেকে জানা যায় যে, ফেরাউনকে ডুবে যাওয়ার পর মৃত্যুর পূর্বেই উদ্ধার করা হয়েছিল। অর্থাৎ জলমগ্ন হয়ে ডুবেছিল ঠিকই কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই বের করে আনা হয়েছিল। এরপর সে প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত পঙ্গু অবস্থায় বিছানায় পড়ে পড়ে বেঁচে ছিল। [দেখুন ঃ Lan Wilson এর বই ঃ Exodus Enigma - 1985]। ফেরাউন সম্পর্কে আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগের লোকেরা কল্পনাও করতে পারেনি যে, তার মৃতদেহ কখনও পাওয়া যাবে। মৃতদেহ তো দূরের কথা, একথাও কেউ চিন্তা করেনি যে, ফেরাউন ডুবে যাবার পর আবার তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

আল্লাহ্‌তাআলা আঁ হযরত (সঃ)-এর সেই যুগে খবর দিয়েছেনঃ

"তিনিই সেই সত্তা যিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন যাদের মাঝে একটি মিষ্ট সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, তিক্ত এবং তিনি উভয়ের মাঝে এক আড়াল ও শক্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছেন (সূরা ফুরকান ঃ ৫৪)।

এ রকম দু'টি সমুদ্রকে একত্র করার কথা সেই যুগের আরবরা কখনও কল্পনা করে নি। বড় বড় আলেমরাও কল্পনা করেনি যে, এমন দু'টি পৃথক পৃথক সমুদ্র যাদের মাঝে এমন প্রতিবন্ধকতা যা বাহ্যতঃ ভেঙ্গে সরানো সম্ভব নয়, একদিন এদেরকে আল্লাহ্ মিলিত করবেন। এখন দেখুন, এ ভবিষ্যদ্বাণী কত চমৎকারভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের কথা বলা হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের পানি তুলনামূলকভাবে মিষ্টি এবং আটলান্টিকের পানি লবণাক্ত। চল্লিশ মাইল লম্বা পানামা খাল খনন করে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে এ দুই মহাসাগরকে। আমেরিকা ১৯০৪ইং থেকে ১৯১৪ইং সনের দিকে এ কাজ করেছে। এ দুই সাগরকে ১৮৮১ থেকে ১৮৯৮ইং পর্যন্ত সংযুক্ত করতে চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তখন সাফল্য লাভ হয়নি।

এবার সূরা রহমানের (আয়াত ২০-২৩) আয়াত দেখুন ঃ "তিনি দুই সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করেছেন যে, (এক সময়) উভয়ে মিলিত হবে। বর্তমানে উভয়ের মাঝে এক প্রতিবন্ধক আছে (যদ্দরুন) ওরা একে অপরের মাঝে প্রবেশ করতে পারে না। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? উভয় (সমুদ্র) হতে মুক্তা এবং প্রবাল বহির্গত হয়।

এখানে বলা হয়েছে, তিনি উভয় সমুদ্রকে মিলিত করবেন, যুক্ত করে দিবেন। পূর্বে যে দুই সমুদ্রের মিলানোর খবর ছিল, সেই দুই সমুদ্র অন্য ছিল। এখানে অন্য দুই সমুদ্রের মিলানোর খবর দেয়া হয়েছে। এখানে সুয়েজ খালের কথা বলা হচ্ছে। এমন দুই সমুদ্রকে যুক্ত করা হবে যারা উভয়ে প্রচন্ড বেগে একে অপরের উপর চড়াও হবে। অর্থাৎ এ দুই সমুদ্রের সংযোগ সৃষ্টি হবে তখন এদের ঢেউ এবং স্রোত প্রচন্ড বেগে একে অপরের উপর চড়াও হবে। কিন্তু বর্তমানে এ দুই সমুদ্রের মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা আছে যা অতিক্রম করতে পারছে না।

এখানে দুই সমুদ্রের উল্লেখ করা হয়েছে যার ভেতর থেকে মণি, মুক্তা, ইত্যাদি মূল্যবান সামগ্রী উত্তোলন করা হয়। এ দুই সমুদ্রকে এখন তো মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। আয়াতে ইয়ালতা কিয়ানে শব্দের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা

হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এ দুই সমুদ্রকে যুক্ত করা হবে। আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগের মানুষ তো এ দুই সমুদ্রের কোন খবরও জানত না। এদের যুক্ত হবার কথা তো দূরের কথা। এখানে লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের কথা বলা হয়েছে যাদেরকে সুয়েজ খালের দ্বারা মিলিয়ে বা যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ১৮৫৪ইং থেকে ১৮৬৯ইং সময় কালে ফ্রান্স ও মিশরের সম্মিলিত খরচে ফ্রান্সের একজন ইঞ্জিনিয়ারের নেগরানীতে ১০১ মাইল দীর্ঘ এ সুয়েজ খাল খনন করা হয়েছে।

আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগের মানুষ দু'টি পূর্ব বা দুইটি পশ্চিমের কল্পনা কেউ করেনি। সেই যুগে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন ঃ

"(তিনি) দু'টি পূর্বের প্রভু, দু'টি পশ্চিমের প্রভু" (সূরা রহমান ঃ ১৮)। আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগের মানুষ একটি পূর্ব ও একটি পশ্চিম আছে বলে জানতেন। এ ছোট্ট আয়াতটুকুতে এ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, আমাদের যুগে এসে একাধিক পূর্ব ও একাধিক পশ্চিম আবিষ্কৃত হবে।

আকাশ থেকে অগ্নিবর্ষণের খবর, আগুন বৃষ্টির খবর কুরআন শরীফে দেয়া হয়েছে ঃ

"তোমাদের উভয়ের উপর অগ্নি-শিখা এবং গলিত তাম্র প্রেরণ করা হবে, তখন তোমরা (সেই অগ্নি-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য) একে অপরের সাহায্য করতে পারবে না (সূরা রহমান ঃ ৩৬)।

যারা রকেটে বসে নভোমন্ডলে যাত্রা করে তখন তাদের উপর এ অগ্নি বর্ষণ হয়। এরা রকেটে বসে উপরে যেতে থাকে। এরা রকেটের বাইরে এক মুহূর্তও নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। এ অগ্নি-বৃষ্টির খবর আল্লাহ্তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে দিয়েছেন যা সেই যুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারে নি। কিন্তু আজ তা পূর্ণতা লাভ করেছে।

এবার এটম বোমার খবর এবং এ জাতীয় ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রের খবর শুনুন ঃ

"এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে যে, হুতামা কী? এটা আল্লাহ্র লেলিহান আগুন, যা অন্তরসমূহের গভীরে গিয়ে পৌঁছুবে। নিশ্চয় এটাকে চতুর্দিক থেকে তোমাদের উপর বন্ধ করে দেয়া হবে সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহে" (সূরা হুমাযা ঃ ৬-১০)। এখানে হুতামা অর্থ এটম বোমা। এটম এবং হুতম শব্দ উচ্চারণে একই রকম। হুতামা শব্দের প্রকৃত অর্থ আরবী ভাষায় ছোট্ট ছোট্ট কণা। "ছোট ছোট কণার মাঝে আগুন উত্তেজিত করা হয়েছে।" আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগে কেউ কল্পনা করেছিল যে, এমন এটম (ছোট্ট ছোট্ট কণা) এর মাঝে আল্লাহ্র আগুন ভরা আছে? যে আগুন মানুষের হৃদয়ের উপর প্রথম আক্রমণ করে।

বিজ্ঞানীরা খুব ভালই জানেন যে, এটম ফাটলে প্রথমে দীর্ঘ হয়ে লম্বা হয়ে উঠে তারপর বিস্তীর্ণ এলাকায় বিস্তার লাভ করে এবং ধ্বংস করে দেয় সব কিছু। এর আগুনের উত্তাপে মানুষ মরে না। বরং আগুনের গরম রশ্মি মানুষের হৃদয়কে আক্রমণের পূর্বেই রেডিয়েশন-এর রশ্মি মানুষের হৃদপিন্ডকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে। একথাই এখানে কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে যে,শরীর আগুনে জ্বলে যাওয়ার পূর্বেই রেডিয়েশন তার হৃদযন্ত্রকে স্তব্ধ করে দেয় এখানে আয়াতে যা বলা হয়েছে- বিজ্ঞানীরাও ঠিক তা-ই লিখেছেন এটম বোমা সম্পর্কে। (এটম বোমার) রেডিয়েশনের প্রবাহ দ্বারা পৃথিবীতে এ যাবৎ যে ধ্বংস লীলা ঘটেছে-এর নমুনা হিরোসীমা ও নাগাসাকীতে (জাপান) দেখা গেছে। আমি নিজেও গিয়ে দেখেছি। তখন পর্যন্ত সেই এটমের প্রভাবে আক্রান্ত মানুষ সেখানে বর্তমান ছিল। এ দু'টি শহর সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। দশ লক্ষের বেশি মানুষ মারা গেছে। ওরা সবাই এটম বোমার রেডিয়েশনের প্রভাবে মারা গেছে। উত্তাপে জ্বলে মরে নি।

এবার আঁ হযরত (সঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলার খবীর সিফতের যেভাবে বিকাশ ঘটেছে তার কয়েকটি নমুনা পেশ করছিঃ

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) হযরত ওবাদা বিন সাবেতের স্ত্রী উম্মে হারাম বিনতে মলহান (রাঃ)-এর গৃহে যেতেন। উম্মে হারাম (রাঃ) আঁ হযরত (সঃ)-কে আপ্যায়ন করতেন। একদিন আঁ হযরত (সঃ) উম্মে হারামের গৃহে গেলেন, উম্মে হারাম (রাঃ) খাবার পেশ করলেন, আঁ হযরত (সঃ) খাবার পরে বিশ্রাম করছিলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) আঁ হযরত (সঃ)-এর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন আঁ হযরত (সঃ) ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আঁ হযরত (সঃ) জাগ্রত হলেন। তখন তিনি হাসছিলেন। হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি হাসলেন কেন? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'আমাকে একটি দৃশ্য দেখানো হলো। সেখানে আমার উম্মতের কিছু লোককে দেখলাম, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদের জন্য সমুদ্র পথে সফর করছে। দেখলাম তাদেরকে বাদশাহ্দের মত মনে হচ্ছিল। একথা শুনে উম্মে হারাম (রাঃ) আবদার করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! দোয়া করবেন যেন আমাকেও আল্লাহ্তাআলা তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' আঁ হযরত (সঃ) তার জন্য দোয়া করলে। তারপর পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আঁ হযরত (সঃ) জেগে উঠলেন। তখনও তিনি হাসছিলেন। হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! কেন হাসছেন? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, আমার সামনে আমার উম্মতের কিছু গাজীকে দেখানো হলো, যেমন তিনি (সঃ) প্রথমবার বলেছিলেন। হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) আরয করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার জন্য দোয়া করবেন, আমাকেও যেন আল্লাহ্ তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।'

আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'তুমি প্রথম গ্রুপে থাকবে।' পরবর্তীকালে বাস্তবে দেখা গেল যে, হযরত আমীর মুয়াবিয়ার যুগে হযরত উম্মে হারাম বিন্তে মলহান (রাঃ) সামুদ্রিক সফরে যাত্রা করেছিলেন। এরপর সমুদ্র বন্দরে নেমে যানবাহনের উপরে বসে যাওয়ার সময় (যানবাহন থেকে পড়ে গিয়ে) তিনি মারা গেলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত হবে না।' এরপূর্বেই তিনি মারা গেলেন (সহী মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত)।

হযরত উম্মে ওয়ারকা বিনতে আব্দুল্লাহ্ বিন হারিস আনসারী (রাঃ) কুরআনের কিছু অংশ নিজের কাছে জমা করেছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) যখন বদরের যুদ্ধের জন্যে বের হলেন, উম্মে ওয়ারকা হুযূর (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সাথে যুদ্ধে যাবার অনুমতি চাচ্ছি। আমি রোগীদের সেবা-যত্ন করতে পারব। হয়ত শহীদ হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি।' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, তোমার শাহাদত (শহীদ হওয়া) অবধারিত করা আছে। আঁ হযরত (সঃ) তাকে 'শহীদা' বলে ডাকতেন। আঁ হযরত (সঃ) তাকে বলেছিলেন, সে যেন নিজ গৃহের সকলকে নিয়ে জামাতে নামায পড়ান। উম্মে ওয়ারকার সাথে একজন মুয়ায্যিনও ছিলেন, যে আযান দিতেন এবং উম্মে হারাম নিজ গৃহে নামাযের

জামাতের ইমামতি করতেন।" এখানে দেখা যাচ্ছে, মহিলারা গৃহের অভ্যন্তরে আযান দিতে পারে। তবে এ রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, তারা মুআয্যিন রেখেছিলেন। যাক এর পরের ঘটনা এই যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে উক্ত উম্মে ওয়ারকা (রাঃ)-কে তার গোলাম (দাস ও দাসী) মিলে হত্যা করে পালিয়ে গিয়েছিল। হযরত উমর (রাঃ) যখন খবর পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে সকলকে বললেন, 'উম্মে ওয়ারকাকে তাঁর দাস ও দাসী মিলে হত্যা করে পালিয়েছে। আঁ হযরত (সঃ)-এর কথা সত্য প্রমাণিত হলো যে, সে শহীদ হবে।' এরপর সেই দাস-দাসী যারা হত্যা কান্ড ঘটিয়েছিল, তাদেরকে ধরে আনা হয়েছিল এবং এটাই প্রথম ঘটনা ছিল যে, হত্যাকারীদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল'

(মুসনাদ, ইসহাক বিন রাহ্ওয়ায়েহ্; ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩৫)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, 'আমরা খায়বারের যুদ্ধে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আঁ হযরত (সঃ) এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, 'এ ব্যক্তি জাহান্নামের অধিবাসী হবে। অথচ সেই ব্যক্তি দাবী করত সে মুসলমান। সেই ব্যক্তি যুদ্ধে খুব সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করছিল এবং বহু আঘাত পেয়ে আহত হয়েছিল। এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে বলল, সেই ব্যক্তি তো যুদ্ধে খুব লড়াই করেছে, যার সম্পর্কে হুযূর (সঃ) জাহান্নামী হবে বলেছেন। অপর এক ব্যক্তির মনেও সন্দেহ হলো। এ ব্যক্তি সেই আহত ব্যক্তির কাছে খোঁজ-খবর করতে গেল। এ ব্যক্তি দেখল, সেই আহত ব্যক্তি ক্ষত বা যখমের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্ম-হত্যা করে নিজে নিজেকে হত্যা করে ফেলল। এভাবে আঁ হযরত (সঃ)-এর বাণী পূর্ণতা লাভ করল যে, সেই ব্যক্তি জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল" [বুখারী; বাব আল আমালো বিন খাওয়াতীম]।

৭ম হিজরী সনে আঁ হযরত (সঃ) বাদশাহ্গণের নামে তবলীগী পত্র লিখেছিলেন। ইরান সম্রাট কিসরার নামেও একটি পত্র লিখেছেন। এ পত্র সম্পর্কে ইবনে সা'দ ও তাবরী নিজ নিজ ইতিহাসে বিস্তারিত বর্ণনা লিখেছেন। উভয়ে লিখেছেন, ইরান সম্রাট কিসরা আঁ হযরত (সঃ)-এর পত্র পড়ে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলে দিয়েছে। এ খবর আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে পৌছলে হুযূর (সঃ) দোয়া করলেন, 'আল্লাহ্ ইরান সম্রাটের সাম্রাজ্যও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দাও।' ওদিকে ইরানের বাদশাহ্ ইয়ামেনের গভর্ণরকে আদেশ দিল, হেজাযে আবির্ভূত নবীর দাবীদারকে বন্দী করে ধরে আনার জন্য দু'জন বাহাদুর ব্যক্তিকে পাঠাও। ইয়ামেনের গভর্ণর আদেশ অনুসারে একখানা পত্র লিখে দু'জন লোককে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে পাঠালেন। ওরা দু'জন আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে পত্র পেশ করল। আঁ হযরত (সঃ) পত্র পড়ে হাসলেন। এরপর সেই দু'জনকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা তো হয়রান হয়ে গেল। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'আজ তোমরা এখানে অবস্থান কর, কাল তোমাদেরকে সেই পত্রের জবাব দেব।' পরের দিন আঁ হযরত (সঃ) বললেন, "আজ রাতে আমার আল্লাহ্-আমার প্রভু তোমাদের প্রভুকে হত্যা করেছেন।" অতএব তোমরা যেতে পার। এ খবর এমনই এক খবর যা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

তারা দু'জন ফেরত চলে গেল ইয়ামেনে। রাস্তায় তারা খবর পেল, একজন তাদের দেশের লোক তাদেরকে বলল, 'রাতে আমাদের সম্রাট কিস্রা খুন হয়েছেন। তিনি নিজ পুত্রের হাতে খুন হয়েছেন। ইয়ামেনের গভর্ণর সেই দু'জনের মুখে আঁ হযরত (সঃ)-এর কথা শুনে বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! এমন কথা সাধারণ মানুষ তো কখনও বলতে পারে না। নিশ্চয় এ আল্লাহ্র নবীর কথা'!

অল্প সময় পরই ইরানের সম্রাট শিরওয়াই, কিসরার পুত্র নতুন সম্রাটের পত্র ইয়ামেনের গভর্ণর বাজান পেয়ে গেলেন। তাতে কিসরার হত্যার খবর এবং আরবী নবী (সঃ)-এর গ্রেফতারীর আদেশ বাতিল করা হয়েছিল। ইরানের নতুন বাদশাহ্র এ পত্র পেয়েই ইয়ামেনের গভর্ণর বাজান ও অন্যান্য ইরানী যারা ছিলেন সবাই ইসলাম কবুল করেছিলেন।

[তবাকাতে কুবরা-ইবনে সা'দ রচিত; ১ম খন্ড; পৃঃ ২৬০। তাবারী ইবনে জারির তাবারী রচিত; ২য় খন্ড; পৃঃ ১৩৪]।

এবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলছি যা তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে খবর পেয়ে বলেছিলেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত খবর না হলে কখনই সেগুলো পূর্ণতা লাভ করত না।

এক যুগে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের বিপরীতে রাশিয়ান সাম্রাজ্যের বড় মর্যাদা ছিল। রাশিয়ান সম্রাট জারের এত ক্ষমতা ছিল যে, তখন চিন্তাই করা সম্ভব ছিল না যে, তার অবস্থা এমন হতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্র কাছ থেকে ইলহাম পেলেন ঃ "জারও হবে তো হবে সে সময় বাহালে যার, অত্যন্ত জরাকীর্ণ অবস্থা।"

১৯০৫ইং সনে হযরত আকদস উক্ত ইলহাম পেয়েছিলেন। এরপর রাশিয়াতে বিপ্লবের সময় জার ও তার পরিবারবর্গের অবস্থা অত্যন্ত অপমানজনক, অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক হয়েছিল। প্রথমে রাজ ক্ষমতা ছাড়তে হলো। এরপর কারাগারের দুর্বিষহ, যন্ত্রণাদায়ক জীবন। এরপর ১৬ জুলাই, ১৯১৮ইং তারিখে পুরো পরিবারকে হত্যা করা হয়েছিল। এ হত্যাকান্ড বড়ই হৃদয় বিদারক হয়েছিল। তার স্ত্রীর সাথে সেখানে তার সামনে সিপাহীরা অপকর্ম করেছিল, তার কিছুই করার ছিল না এবং অত্যন্ত মর্মান্তিক অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করা হয়। পৃথিবীর পত্র-পত্রিকায় সেই ঘটনা যেভাবে ছাপা হলো তা ঠিক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইলহামে প্রাপ্ত খবরের অনুবাদের মত ছিল।

এরপর হযরত মৌলভী আব্দুর রহমান শহীদ (রাঃ) এবং হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর ঃ

১৮৮৩ইং সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে খবর দেয়া হয়েছিল ঃ "শাতানে তুয্বাহানে ওয়া কুল্লু মান আলায়হা ফান্- দু'টি ছাগল জবাই করা হবে পৃথিবীতে কেউই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না" [বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খন্ড; রূহানী খাযায়েন ১ম খন্ড; পৃঃ ৬১০]।

উক্ত খবর অনুসারে হযরত মৌলভী আব্দুর রহমান (রাঃ) এবং হযরত সাহেবযাদা আবদুল লতীফ শহীদ (রাঃ) কাবুলে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহীদ হয়েছিলেন। ১৯০১ইং এর মাঝামাঝি সময়ে মৌলভী আব্দুর রহমান (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছিল।

সেই যুগের আফগানিস্তানের আমীর আব্দুর রহমান খাঁ যিনি উক্ত শহীদের শাহাদতের উদ্যোক্তা ছিলো - শীঘ্রই আল্লাহ্র গযবে ধৃত হয়েছিলো। ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯০১ইং তারিখে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। হাজার চেষ্টা ও

চিকিৎসার পরও উঠতে বসতে সক্ষম হয় নি। অবশেষে ৩ অক্টোবর, ১৯০১ইং তারিখে ইহজগৎ ত্যাগ করে।

১৪ জুলাই, ১৯০৩ইং মঙ্গলবার কাবুল শহরে হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ (রাঃ)-কে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহীদ করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ কিতাবে এ ঘটনার [শাহাদাতুল কুরআনে] উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্য কান্ড এই যে, শাহাদতের ঘটনার পর পরই সেই অঞ্চলে ভয়াবহ এক ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়েছিল। এমন ভয়াবহ ঝড় যে, কাবুলের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও এমন ঝড়ের উল্লেখ নেই। লাল রং এর সেই ঘূর্ণিঝড় ছিল বড়ই ভয়াবহ। সেই সময় সেখানে একজন ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ ঝড়ের বিবরণ লিখেছেন। কেউ কল্পনা করতে পারে নি যে, সেই মৌসুমে এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় হতে পারে। সাথে এক কলেরার আকারে মহামারী বিস্তার লাভ করেছিল। অত্যন্ত গরম মৌসুম ছিল, মে-জুন মাসে কখনও কলেরা এ ভাবে বিস্তার লাভ করে না- যা সেখানে হয়েছিল।

সরদার নসরুল্লাহ্ খানের স্ত্রী ও যুবক পুত্র সেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মরেছিল। এ নসরুল্লাহ্ খানই তো হযরত সাহেবযাদা শহীদের বিরুদ্ধে আনিত ফতোয়াকে কার্যকর করার আদেশ দিয়েছিলো। সেই ইংরেজ প্রতিনিধি লিখেছেন, সরদার নসরুল্লাহ্ খান তার স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যু দেখে পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলো। এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যেতো এবং স্ত্রীকে ডাকতো, খুঁজতো,. 'তুমি কোথায়?' খুঁজে পেতনা। এভাবে কাবুলীদের উপর আল্লাহ্র এমন গযব নাযেল হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত শেষ হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কাবুলের মাটি অভিশপ্ত হয়ে গেছে। এতকাল পূর্বে যে ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয়েছিল তা এখনও শেষ হচ্ছে না।

হযরত মালেক গোলাম হোসেন, পিতা মিয়া করীম বখ্শ (রাঃ) রোহতাস, জিলা ঝিলামের অধিবাসী, আনুমানিক ১৮৯১ইং সনে বয়াত করেছিলেন। ১৮৯২ইং সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নির্দেশে ১৮৯৪ইং সনে হিজরত করে কাদিয়ানে চলে আসেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আয়নায়ে কামালতে ইসলাম কিতাবে ৩১৩ সাহাবায়ে কেরামের যে তালিকা প্রকাশ করেছেন এতে তাঁর নামও লিখেছেন। ইনি অন্ধ ছিলেন। লংগর খানায় কাজও করতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ

"হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মাগরেবের নামাযের পর শায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করতেন। তখন আমি হযরত সাহেবের শরীর টিপে দিতাম। আমার ছেলে মোহাম্মদ হোসেনও হযরতের শরীর টিপতে আমার সাথে শরীক হতো। একদিন হযরত সাহেব চোখ বন্ধ করে বিশ্রামে ছিলেন। আমরা শরীর টিপে দিচ্ছিলাম। হযরত উম্মুল মু'মিনীনও নিকটে বসেছিলেন। হঠাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) চোখ খুলে দেখলেন ও বললেন, 'মুহাম্মদ হোসেন ডেপুটি কমিশনার হবে।"

একজন অন্ধ ব্যক্তি লংগরে তন্দুরে রুটি সেঁকতেন। তাঁর ছেলের সম্পর্কে হযরত (আঃ) বললেন, "সে ডেপুটি কমিশনার হবে।" এরপর দেখুন কত চমৎকারভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে!

সেই মোহাম্মদ হোসেন ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। পরে কৃষি বিভাগের ক্যানাল জল সেচ বিভাগে রাওয়াল পিন্ডিতে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন। এরপর চাকরী ছেড়ে দেন। পড়াশোনা করেন। এরপর লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে। আফ্রিকায় প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। খুব খ্যাতি লাভ করেন। এমন সময় নাইরোবীর ডেপুটি কমিশনার (সম্ভবত) চার মাসের ছুটি নিয়ে গেলে তার স্থলে এ মোহাম্মদ হোসেনকে ডেপুটি কমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়। দেখুন কবেকার কথা কিভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। একজন অতি সাধারণ অন্ধ ব্যক্তির ছেলে ডেপুটি কমিশনার হয়ে গেলেন।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াত নং ৮ পৃঃ ৯৫-৯৯)।

আল্লাহ্তাআলা আমাকে বার বার খবর দিয়েছেন, 'তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, মানুষের অন্তরে আমার জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করবেন এবং আমার জামাতকে পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত করবেন সম্প্রসারিত করবেন। সকল ফিরকার উপর আমার ফিরকাকে জয়যুক্ত করবেন। আমার ফিরকার মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে এতটা পরিপক্কতা লাভ করবেন যে, তারা নিজেদের সত্যতার নূর এবং যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সকলের প্রত্যেক জাতি বাক্শক্তি স্তব্ধ করে দেবেন। আমার এ ঝর্ণা থেকে পানি পান করবে। এবং আমার এ জামাত (সিলসিলাহ্) দ্রুতগতিতে প্রসার ও বিস্তার লাভ করবে এবং সমগ্র পৃথিবী এর আওতায় এসে যাবে। অনেক বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি হবে, বড় বড় অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তবে আল্লাহ্তাআলা এ সকল কিছুকে মাঝখান থেকে সরিয়ে দিবেন এবং নিজ ওয়াদা পুরণ করবেন। ...

সুতরাং হে শ্রবণকারীরা আমার এ কথাগুলোকে স্মরণ রাখ এবং এ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে নিজ সিন্দুকে হেফাযতে রাখ যে, এ সব কথা - আল্লাহ্র বাণী অবশ্যই একদিন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে, বাস্তবরূপ লাভ করবে (তাজাল্লীয়াতে ইলাহীয়া, পৃঃ ২০-২১)।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ আব্দুস সালাম মরহুম সম্পর্কে রেওয়ায়াত আছে যে, বাল্যকালে তিনি কথা বলছিলেন না। তাঁর পিতা এ ছেলে সম্পর্কে গোলাম রসূল রাজেকী (রাঃ)-এর কাছে বললেন, আমার এ ছেলে তো মনে হচ্ছে বড় ভাল ছেলে, মেধাবী ছেলে, কিন্তু সে যে কথা বলে না? মৌলভী রাজেকী সাহেব (রাঃ) বলেছিলেন, চিন্তা করবেন না, এ ছেলে এমন কথা বলবে যে, সারা পৃথিবী শুনবে। বাস্তবে তাই হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা ডাঃ সালামকে তৌফীক দিয়েছেন; তাঁর কথা পৃথিবী শুনেছে।

খুতবা সানীয়ার পরে হুযূর (রাহেঃ) বলেছেন ঃ

কোন কোন ভাই অভিযোগ করেছেন যে, আমি দীর্ঘ খুতবা দিচ্ছি। কিন্তু এটা আমার জন্য আবশ্যক। কিছু কথা বুঝিয়ে বলতে হয়। ইরাক সম্পর্কে দু'একটি কথা বলছি।

এটি অনেক বড় ধ্বংস নেমে এসেছে। হৃদয় প্রকম্পিত হয়। যেসব ছবি দেখানো হচ্ছে তা দেখে মনে হচ্ছে, যে হাতগুলো তাদের আহত করেছে সে হাতগুলো এখন আবার মলম লাগাচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, এরা মানবতার সেবা করছে। সমস্ত পৃথিবীকে বলা হচ্ছে, দেখ আমরা ইরাকীদের পানিও দিচ্ছি খাদ্যও দিচ্ছি, কাপড়ও দিচ্ছি। অথচ আসল ঘটনা এই যে, তারা তো এদের পানি কেড়ে নিয়েছে, এদের খাদ্য কেড়ে নিয়েছে। তাদের কাপড় কেড়ে নিয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, তিনি এদের সাথে কী ব্যবহার করবেন! আমাদের অন্তরে করুণার উদ্রেগ হয়। আল্লাহ্ দয়া করুন।

[আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ২৪ অক্টোবর, ২০০৩ইং]

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

(পূব প্রকাশিত অংশের পর)

পর্ব ৪ ঃ অধ্যায় ঃ ১

ওহী ইলহামের প্রকৃতি

ধর্মের সূচনা লগ্ন থেকেই ওহী ইলহাম কি, এর উৎস ও মর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন মানুষের মাঝে বহু মতভেদ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজকের যুগের বেশির ভাগ বৌদ্ধ, কনফুসীয় ও তাওবাদীদের ধারণা অনুযায়ী তাদের ধর্মগুরুদের মনের অন্তর্নিহিত এক অনুভূতির অবস্থা, যা মনের সচেতন বা অর্ধচেতন অবস্থায় ব্যক্ত করা হয়েছে (from with in their conscious or subconscious minds), তার নামই ওহী। আবার অন্যান্য ধর্মের অভিমত হলো এই যে, ওহী একটি অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা, যা কোন বহিঃস্থ উৎস থেকে, মানুষের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য সূচিত হয় (an experience arising from an external source), আর এর উৎস হচ্ছেন এক চিরন্তন মহাজ্ঞানী প্রভু (and everlasting-All wise God)।

আমরা যদি আমাদের আলোচনার পরিধিকে ধর্ম-জগতের বাইরে সম্প্রসারিত করি, তাহলে জেনে বিস্মিত হই যে, অনেক জটিল বৈজ্ঞানিক সূত্র ও সমস্যার সমাধান ওহীর মাধ্যমে কোন কোন বৈজ্ঞানিকের নিকট জানানো হয়েছিল (highly complex information conveyed through revelation to some scientists)। উদাহরণস্বরূপ, একজন জার্মান রাসায়নবিধ Fredrich August Kekule এর কথা উল্লেখ করা যায়, যিনি ১৮৬৫ সালের দিকে রসায়নের এমন একটি জটিল বিষয়ের মীমাংসা খুঁজছিলেন, যা অনেক গবেষকও জানতে সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু কেউ এর কোন সমাধান পাচ্ছিলেন না। এক রাত্রে Kekule স্বপ্নে দেখেন, একটি সাপ তার লেজ মুখে ঢুকিয়ে রেখেছে (a snake with its tail hold in its mouth), যার আকৃতি অনেকটা আংটির মত। এ স্বপ্ন থেকেই Kekule উক্ত জটিল সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পান, যার ফলশ্রুতিতে কোন কোন অণুমিশ্র বা যৌগিক রসায়নের ক্ষেত্রে কিভাবে অবস্থান করে এর একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন। এটা এমন একটি আবিষ্কার ছিল যা জৈব রসায়ন অনুধাবনের ব্যাপারে এক ধরনের বিপ্লব ঘটায় (created a revolution in the understanding of organic chemistry)। Kekule তার স্বপ্নের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌছান যে, বেনজিন molecule এ কার্বন অণুসমূহ সমন্বিত হয়ে একটি আংটির মত কাঠামো তৈরী করেছে। আর এ সূত্রের উপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যতে সমন্বিত জৈব রসায়নের ক্ষেত্র তৈরী হয়, যেখানে বিভিন্ন অংশ দ্বারা একটা গোটা বস্তু গঠনের প্রযুক্তি উদ্ভাসিত হয় এবং ঔষধ প্রস্তুত ও মিশ্রণের কার্যকর প্রয়োগ দ্বারা এ জ্ঞান আজ পৃথিবীকে কল্যাণমন্ডিত করে চলেছে। সমগ্র মানবজাতি মূলত Kekule এর সেই স্বপ্নের নিকট ঋণী, যার মাধ্যমেই Kekule জৈব রসায়ন বিশেষ করে সমন্বিত জৈব রসায়ন (Synthetic Organic chemistry) সংক্রান্ত এ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তেমনি আরেক উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক হচ্ছেন Elias Howe, যিনি সেলাই মেশিনের আধুনিক নির্মাতা। সেলাই মেশিনের উৎকর্ষের জন্য Mr. Howe অনেক চিন্তা ও জোর চেষ্টা সত্ত্বেও কোন সমাধান না পেয়ে অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েন। অবশেষে এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে নিজেকে একদল বর্বর হিংস্র লোক দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় দেখতে পান। তারা তাকে এই বলে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে যে, তিনি যদি তাদেরকে একটি সেলাই যন্ত্রের নক্শা ঠিকভাবে তৈরী না করে দেন, তবে তারা তাকে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু যখন এ কাজে তিনি ব্যর্থ হন, তখন ওই হিংস্র লোকগুলো তাকে একটা গাছে ঝুলিয়ে রেখে বর্শা বা বল্লম দ্বারা হত্যা করতে উদ্যত হয়। Mr. Howe আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেন যে, তাদের বর্শা বা বল্লমের ডগার একটি চোখের মত অংশ রয়েছে (eyelets on their spearheads)। স্বপ্নভঙ্গের পরই Mr. Howe দীর্ঘ দিন ধরে অস্থির তার এ সমস্যার সমাধান লাভ করেছেন বলে মনে করেন। স্বপ্নে বর্শার ডগায় চোখের অনুরূপ তিনি সেলাই মেশিনের সূঁচের মাঝে একটি চোখের মত ছিদ্র তৈরী করেন। আর এর ফলেই সেলাই যন্ত্রে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। আজ ভাবতেই কষ্ট হয় যে, Mr. Howe যদি তার স্বপ্নে এ চোখ লাগানোর ইঙ্গিত না পেতেন, তা হলে সমগ্র মানবজাতি পোষাক শিল্পের এ অগ্রগতি থেকে বঞ্চিত থেকে যেত।

বৈজ্ঞানিকদের এ ধরনের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয় যে, এটা মানুষের অবচেতন বা অর্ধ-চেতন অবস্থা থেকে উৎপন্ন একটি ইন্দ্রিয়গত ব্যাপার। মানুষ সচেতন অবস্থায় কোন একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে থাকে, কোন আপাত সমাধান না পেয়ে সে হয়ত ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মনের অবচেতন অবস্থায় ও সেই সমস্যা বা বিষয়টির স্মরণ থেকে সে নিষ্ক্রিয় থাকে না। ফলশ্রুতিতে যেসব তথ্য তার মনে গেঁথে রয়েছে, অবচেতন মনেও তার একটি সম্ভাব্য সমাধান খোঁজার ব্যাপারে সে সচেষ্ট থাকে, আর এভাবেই সে তার একটি সমাধানও পেয়ে যায়। কোন কোন সময় এ সমাধান আসে কোন স্বপ্ন বা দিব্য-দৃষ্টির (visions) মাধ্যমে, আবার কখনো বা মৌখিক বা বাচনিক শব্দের আকারে (in the form of verbal messages)। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, এ পদ্ধতি কি সার্বজনীন, অর্থাৎ, কোন রকম ব্যতিক্রম বাদে, এ ধরনের ওহী-ইলহাম আমাদের অবচেতন মনের ক্রিয়াকান্ডেরই একটি বার্তা মাত্র, মনের ভিতরেই যার উৎপত্তি বা জন্ম? (চলবে)

- অধ্যাপক মোহাম্মদ আমীর হোসেন

আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে?

মূল ঃ মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ, লন্ডন

(৫ম কিস্তি)

সেবার ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক কর্মকান্ড

আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়াছে? প্রশ্ন এই যে, পুণ্য ও সুন্দরের ক্ষেত্রে জামাতে আহমদীয়া কোন্ জিনিসটি বিশ্বকে দেয় নি? কোন জামাত বা জাতির সম্পদ তো হয়ে থাকে এর লোকবল। এদের সম্মিলিত অবস্থার নামই জামাত। আল্লাহ্তাআলার নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত এ জামাতকে এমন বিরল জনশক্তি দান করেছেন যার সংখ্যা নিজেদের সততা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দিন আর দিন বৃদ্ধি পেতে চলেছে। জামাতে আহমদীয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক স্থানে মানবতার সেবার আবেগে ভরপুর হয়ে নিজ নিজ দেশে জাতি ও মানবতার সেবায় নিযুক্ত আছে। প্রত্যেক দেশে জামাতে আহমদীয়া সমাজের সেবায় পরিপূর্ণভাবে অংশ নিচ্ছে। সাধারণ সেবা ছাড়াও, যার স্বীকৃতি সবখানে করা হয়ে থাকে, এ জামাতের ইতিহাস সাক্ষী দেয়, জামাতের খলীফাগণ ও নেতৃবৃন্দ এবং জামাতের এমন সব ব্যক্তিত্ব যাদেরকে আল্লাহ্তাআলা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ দান করেছেন তাঁরা নিজেদের সেবাকে জাতি, দেশ এবং মানবতার কল্যাণে সব সময় উৎসর্গ করে রেখেছেন।

প্রশ্নকারীরা প্রশ্ন করে, আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়াছে? আমি বলি, আহমদীয়তের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দাও আর দেখো, কিভাবে এ জামাত নিজের কলিজার টুকরো সন্তানদেরকে বিশ্বের সেবায় উৎসর্গ করেছে। সেবার যে কোন ক্ষেত্রে জামাতের এমন সুপুত্র পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতি ক্ষেত্রে এক সুস্পষ্ট মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেছে। ভাষার জগতে হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মযহারের সেবা, আফ্রিকার উন্নতি ও গঠনের ক্ষেত্রে শেখ উমরী আবিদীর সেবা, পাকিস্তানের বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও দৃঢ়তার ক্ষেত্রে হযরত সাহেবযাদা মির্যা মুজাফ্ফর আহমদের সেবা এবং দেশের প্রতিরোধ ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে লেফটেনেন্ট জেনারেল আখতার হুসায়েন মালিক, লেঃ জেঃ আব্দুল আলী মালিক ও ফুরকান ফৌজের মুজাহিদগণের সেবা কিভাবে কোন ভদ্রলোক অস্বীকার করতে পারে? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ড: অধ্যাপক আব্দুস সালাম যে কাজ করেছেন এবং যে সুনাম অর্জন করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাকিস্তানের এ সুযোগ্য সন্তান নোবেল পুরস্কার লাভ করে কেবল পাকিস্তানেরই নয় বিশ্ব মুসলিমের শির গর্বে উন্নীত করেছেন। আবার পুরস্কারের সাকল্য অর্থ প্রিয় জন্মভূমি ও বিজ্ঞানের ব্যাপকতার জন্যে উৎসর্গ করে কুরবানীর এক অতুলনীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ আহমদী বৈজ্ঞানিক মুসলমানদেরকে একটি সাহস ও সংকল্প দান করেছেন, আস্থা দান করেছেন এবং উন্নতির আবেগ দান করেছেন। প্রিয় জন্মভূমির স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার সেবা, আন্তর্জাতিক বলয়ে ন্যায়-বিচার ও আইনী সেবা আর সবচেয়ে বেশি এই সেবা যে, অসংখ্য ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পুরস্কারের সৌভাগ্য লাভে হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরউল্লাহ্ খান সাহেব (রাঃ)-এর সেবা বিশ্বের ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে লেখা হয়েছে। এমন কোন শিক্ষিত লোক আছেন কি যিনি আহমদীয়তের এসব সুসন্তানের ব্যাপক, নিঃস্বার্থ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সেবা সম্বন্ধে না জানার সাহস দেখাতে পারেন? কেবলমাত্র সেসব অন্ধ মোল্লা ছাড়া যাদের সম্পর্কে পাকিস্তানের উচ্চ আদালতে প্রধান বিচারপতি মুনীরকে এ কথা বলতে হয়েছিলো ঃ

"চৌধুরী জাফরউল্লাহ্ খান মুসলমানদের খুবই নিঃস্বার্থ সেবা দান করেছেন এতদ্সত্ত্বেও কোন কোন দল তদন্ত আদালতে যেভাবে তাঁর উল্লেখ করেছে তা লজ্জাজনক অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে" (তদন্ত আন্দোলনের রিপোর্ট, পাঞ্জাব দাঙ্গা ১৯৫৩ পৃষ্ঠা ২০৯, পাঞ্জাব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত)।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আহমদী উৎসর্গীকৃত সন্তানদের কোন্ কোন্ সেবার কথা উল্লেখ করবো? এসব সেবা তো পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়িয়ে রয়েছে। এসব ইতিহাসের এমন অংশে পরিণত হয়েছে যেগুলোকে অবশ্যই মিটানো যেতে পারে না।

সব্ত আজ বর জরীরায়ে আলম দাওয়া মিমা

অর্থাৎ পৃথিবীর মানচিত্রে আমাদের কৃতী অম্লান রয়েছে।

নিঃস্বার্থ জনসেবা

আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে? বিভিন্ন দিক থেকে এর বিভিন্ন জবাব দেয়া যেতে পারে। একটি দিক তো এই, আহমদীয়ত নিজের সব কিছু বিশ্বকে দিয়ে দিয়েছে। সব রকম পুরস্কার যা খোদাতাআলা জামাতকে দিয়েছেন জামাত সে পুরস্কারকে বিশ্বের সফলতা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যয় করতে ও দিতে কখনও কার্পণ্য করেনি। কেননা, কৃপণতা ও হীনমন্যতার দৃষ্টিভঙ্গী এ জামাতের স্বভাবে নেই। জামাতে আহমদীয়া এমনিতেই তো একটি সেবক জামাত। একটি নিঃস্বার্থ সেবক, একটি ক্লান্তিহীন সেবক জমাত, এটা এ নীতির ওপরে সদা কর্মরত- ভালবাসা সকলের তরে। ঘৃণা নেইকো কারো 'পরে। অতএব এ জামাত নিজের সব কিছু বিশ্বকে দিয়েছে। খোদা যেসব পুরস্কার দিয়েছেন এর সবটাই মানবমন্ডলীর সেবার জন্যে উৎসর্গ করে রেখেছে।

আহমদীয়তের ইতিহাস এর ওপরে সাক্ষী। যখনই সেবার কোন ক্ষেত্র দৃষ্টিতে এসেছে

জামাতে আহমদীয়ার নির্ভীক, সেবকগণ সর্বদা নিঃস্বার্থ সেবার আবেগ নিয়ে, ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে সে ক্ষেত্রে লাফিয়ে পড়েছে। জামাতের সংখ্যা স্বল্প আর সম্পদও সীমাবদ্ধ। আর্থিক ক্ষেত্রে জামাত কোন সরকারের কখনও সাহায্যও নেয় না আর এর প্রত্যাশীও নয়। তাদের সারা মূলধন তো তাদের সেই চাঁদা যা জামাতের সেই উৎসর্গীকৃত সদস্যগণ বড়ই পরিশ্রমে অর্জিত আয় থেকে, নিজেদের পেট কেটে, নিজেদের প্রয়োজনকে কাট-ছাট করে জামাতের ঝুলিতে ভরে দেন। এ স্বল্প সম্পদ সত্ত্বেও জন সেবার ক্ষেত্রে সব জায়গায় এ জামাতকেই রাত দিন কর্মচঞ্চল পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকার যে কোন দেশে দুর্ভিক্ষ ও খরার পরীক্ষা আসুক, গুজরাতের ভূমিকম্প প্রপীড়িত লোকদের প্রয়োজন দেখা দিক, পাকিস্তানে প্লাবনে আক্রান্ত লোকদের সাহায্যের প্রশ্ন আসুক, জাপানের মত উন্নত রাষ্ট্র ভূমিকম্পে আক্রান্ত বাস্তুহারা লোকদের খাবার পৌছানোর সুযোগ আসুক জামাতে আহমদীয়ার স্বেচ্ছাসেবীগণকে সেবার ঝান্ডা সমুন্নত ক'রে অবনত মস্তকে সেবায় নিয়োজিত দেখা যায়। জামাতের আন্তর্জাতিক Humanity First সেবা কোন স্থানে পিপাসার্ত লোকদেরকে স্বচ্ছ পানি সরবরাহ করছে, কোথাও অন্ধ লোকদের দৃষ্টিশক্তি উপহার দিচ্ছে। যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে দেয়া হচ্ছে তাদেরকে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরবরাহ করছে। গৃহহীনদেরকে ঘর বানিয়ে দিচ্ছে এবং ঘরে ঘরে গিয়ে অভুক্ত লোকদের খাবার ও শিশুদেরকে দুধ সরবরাহ করছে। এ গোটা সেবা কেবল নাম কেনার জন্যে করছে না বা পার্থিব কোন পুরস্কারের আশায় করছে না। কেবলমাত্র ঐশী সন্তুষ্টির খাতিরে যে, ইসলামী শিক্ষা এটাই এবং এটাই আহমদীদের প্রতীক।

জামাতে আহমদীয়া একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জামাত। এর উদ্দেশ্য সারা বিশ্ববাসীকে খোদার প্রতি আহ্বান করা। ইসলামের বাণী পৃথিবীর কোণে কোণে পৌছানো এবং মানব-সন্তানের মাঝে একটি পবিত্র বিপ্লব সৃষ্টি করা। এ মহান উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সাথে জামাত নিজের সীমাবদ্ধ সম্পদ নিয়ে যতটা সম্ভব মানব-সন্তানের শিক্ষাগত, সামাজিক ও দৈহিক কল্যাণ ও সফলতার লক্ষ্যে রাত-দিন কর্মতৎপর থাকে যেন এটাও ইসলাম ধর্মের একটি অংশ। আর খোদার দৃষ্টিতে পসন্দনীয়। পৃথিবীর সেসব দেশ যেখানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে ঘাট্তি ও কমতি রয়েছে সেসব দেশে সেবা জামাতে আহমদীয়া এসব ক্ষেত্রে সেবার ঝান্ডা বছরের পর বছর উন্মুক্ত রেখেছে। আর ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানব সন্তানের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার আবেগের সাথে সত্যিকারের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে।

পরিসংখ্যানের দিক থেকে যতটা সম্পর্ক বর্তমানে বিশ্বের ১৭৭টি রাষ্ট্রে জামাত স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ১৩,২৯১টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এ আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিতরণের সাথে সাথে এখন জামাতের পক্ষ থেকে উন্নতিশীল দেশে ৩৭৩টি স্কুল, ৫টি কলেজ চলছে। এগুলো অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্ঞানালোক ছড়াচ্ছে এভাবে ৩৬টি হাসপাতাল চলছে। এগুলোতে গবীরদেরকে বিনা পয়সার চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হচ্ছে। সেবার ক্ষেত্রে আরও একটি মহান সেবা যা জামাতে আহমদীয়া বিশেষভাবে চতুর্থ খিলাফতকালে দিয়ে যাচ্ছে তা হলো হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে সারা বিশ্বে এ কল্যাণজনক ও প্রভাবিত মাধ্যমে চিকিৎসার জ্ঞানকে সবার নিকট পৌছে দেয়া। এ সফলতার মুকুট ছিলো হযরত খলীফাতুল মসীহে রাবে' (রাহেঃ)-এর প্রাপ্য। তিনি দিন রাত একাকার করে এ প্রসঙ্গে বক্তৃতাও দিয়েছেন, পুস্তক প্রণয়ন করেছেন আর কার্যত সারা বিশ্বে এবং বিশেষ করে গরীব দেশগুলোতে হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারীর জাল বিছিয়ে দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত ৫৫টি দেশে ৬৩২টি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গবীর ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের জন্যে অসাধারণ কার্যকরী প্রভাবের মাধ্যমে চিকিৎসা খুবই ব্যাপকতর ও সস্তায় সরবরাহ করা হয়েছে। প্রত্যেক আহমদী ঘর একটি আরোগ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এর কল্যাণ কেবল আহমদীদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং সারা বিশ্বে পৌছে যাচ্ছে।

এ মহান কৃতীত্ব নিঃস্বার্থ মানব সেবার এ সোনালী দৃষ্টান্ত লা নুরীদু মিনকুম, জাযায়ান ওয়া লা শুকূরান অর্থাৎ আমরা তোমাদের কাছে কোন পুরস্কার এবং কৃতজ্ঞতার প্রার্থী নই (সূরা আদ্‌দাহ্‌র ঃ ১০)-এর জীবন্ত ব্যাখ্যা। আর এসব লোকদের জন্যে একটি উত্তর যারা এটা জিজ্ঞেস করে যে, আহমদীয়ত বিশ্বকে কী দিয়েছে? (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

সংশোধনী

১৫ এপ্রিল, ২০০৪ তারিখে প্রকাশিত আহমদীয়া বুলেটিন-২ এ নিম্নোক্ত ত্রুটি সংশোধন করে নেয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। অনবধানজনিত এ ত্রুটির জন্যে আমরা দুঃখিত।

- সম্পাদক

পৃষ্ঠা নং	কলাম নং	লাইন নং	আছে	হবে
৮	২	১৭	'এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর'	'এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না'

আমার স্মৃতিতে তারুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত

এই খানেই দুই মৌলানা পুনঃ করমর্দন ও কোলাকুলি করিয়া সকলের নিকট হইতে বিদায় নিলেন। তবে তাহার দেওয়া ১৮ই মাঘ আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিল না।

এই বাহাসের পর হইতে তারুয়া এবং নিকটবর্তী গ্রামসমূহে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমন-বার্তা ও সত্যতা সম্বন্ধে অনেক আলাপ - আলোচনা শুরু হইল। মরহুম মুন্সী দিওয়ান উদ্দিন আহমদ সাহেব আহমদীয়তের সত্যতা সম্বন্ধে জানার জন্য কতিপয় প্রশ্ন লিখিয়া হযরত মৌলানা আঃ ওয়াহেদ সাহেবের খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন। হযরত মৌলানা সৈয়দ আঃ ওয়াহেদ সাহেব ইহার উত্তরে ছোট্ট একখানা কিতাব লিখিয়া মুন্সী মরহুম দিওয়ান উদ্দিন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তখন হইত তারুয়াতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে বেশি আলোচনা হইতে লাগিল।

মরহুম মুন্সী দিওয়ান উদ্দিন সাহেব হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন ভাই, ভাতিজা ও অন্যান্য লোকসহ সকলে একত্রে এক সঙ্গে পবিত্র সিলসিলায় দীক্ষিত হইলেন। তাহার ছোট দুই ভাই মুন্সী মুকছেদ আলী, মুন্সী ওয়ায়েজ উদ্দিন সাহেব তাহাদের বিবি ও ছেলে - মেয়েসহ বয়াত গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাতভুক্ত হইলেন। তাহার দুই ভাই উভয়ই আরবী উর্দূ, বাংলা জানা শিক্ষিত লোক ছিলেন। এমনিভাবে তাহাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে ইমাম মানিয়া জামাতভুক্ত হইলেন। তখন হইতে তারুয়াতে আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হইল।

মুন্সী দিওয়ান উদ্দিন আহমদ সাহেব এই এলাকার অতি পরহেযগার, আমানত ও দিয়ানতদার এবং তারুয়ার জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি জুমুআর নামায পড়াইতেন ও খুতবা দিতেন। তিনি এই এলাকায় দিওয়ান উদ্দিন মাষ্টার নামেও পরিচিত ছিলেন। সেই জন্য তাহার বাড়ীকে মাষ্টার বাড়ী বলা হইত। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এই সময়ে তারুয়ার একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও এলাকার অনেক গ্রামের অতি সাহসী ধর্ম-পরায়ণ সর্দার মুন্সী মৈজদ্দিন সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যাইয়া হযরত মৌলানা আঃ ওয়াহেদ সাহেবের সান্নিধ্যে তাঁহার নিকট হইতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত হওয়ার কতিপয় আয়াত লিখিয়া আনিয়া এলাকার মৌলানা সাহেবগণের বাড়ী বাড়ী যাইয়া লিখিতভাবে এই আয়াতসমূহের উত্তর চাহিতেন। কাহারও নিকট হইতে সঠিক উত্তর না পাইয়া তিনিও তাহার পরিবারের সকলকে লইয়া পবিত্র সিলসিলায় দীক্ষিত হইলেন। তিনি আকৃতিতে ছোট খাট লোক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, নির্ভীক, সত্যপরায়ণ, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সমাজ সেবক, অতি ধৈর্যশীল লোক ছিলেন। তাহার অতি নিকটতম বন্ধু মুন্সী ওয়াহেদুল্লাহ্ সাহেব অনেক নিদর্শন দেখিয়া ঈমান আনেন ও ঈমান আনার পরও অনেক নিদর্শন দেখিয়া মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

ওয়াহেদুল্লাহ্ সাহেব তাহার পিতার একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন। তাহার পিতা প্রথমে তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। অপর দিকে মুন্সী আউছাফ আলী সাহেব তাহার পিতার একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন। আউছাফ আলীর পিতা মুন্সী সুন্দর আলী কিছু দিনের মধ্যেই বিশেষ নিদর্শন দেখিয়া আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়া বাকী জীবন দোয়া দুরূদ কুরআন পাক রাত দিন তেলাওয়াত করিয়া অতি উচ্চ মু'মিন হইয়া দুনিয়া হইতে বিদায় নেন। অপর দিকে মুন্সী ওয়াহেদুল্লাহ্ সাহেবের পিতা জুয়াদুল্লাহ্ হাজী সাহেব পুত্রকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া সারা জীবন আহমদীয়তের বিরোধিতা করিয়া শোচনীয়ভাবে দুনিয়া হইতে বিদায় নেন।

এই সমস্ত মু'মিনের নিকটতম সময়ের মধ্যে যাহারা বয়াত করেন, তাহাদের মধ্যে মরহুম মুন্সী আলী আকবর সাহেব অন্যতম। তিনি অত্যন্ত মেহমাননেওয়াজ ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি অত্যন্ত গরীবির মধ্যে জীবন যাপন করিলেও আহমদী মেহমান আসিলে সকলের পূর্বেই তিনি মেহমান বাড়ীতে নিয়া খাওয়া থাকার সাধ্যমত সেবা-যত্ন করিতেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত মুরব্বী মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের ছোট ভাই মাহবুবুর রহমান অনেক দিন তারুয়া জামাতে থাকিয়া ছেলে-মেয়ের তা'লীম তরবিয়ত দিতেন। তাহার বাড়ীতে থাকিয়াই খাওয়া-দাওয়াও করিতেন। আলী আকবর সাহেব আহমদুল্লাহ্ সাহেবের চাচাত ভাই।

মুন্সী আলী আকবর সাহেব এবং আমি কাদিয়ান হইতে বয়াত করিয়া বাড়ী আসার পর তাহার অনেক আত্মীয়ের বাড়ীতে তবলীগ করার জন্য আমাকে লইয়া যাইতেন। কোন কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে ৩/৪ দিন অবস্থান করিয়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা বর্ণনা করিয়া তবলীগ করিতাম। তারুয়ার মুখলেস সাবেকুন আউয়ালীনদের মধ্যে মুন্সী মুহাম্মদ রফিক সাহেব ছিলেন অন্যতম। মুন্সী আঃ হামিদ তবলীগ পসন্দ করিতেন। জামাতের খেদমতগার মুন্সী দিওয়ান উদ্দিন আহমদ সাহেবের পর যাহারা মসজিদ ও আঞ্জুমানের জন্য গরীবির মধ্যেও জমি দান করিয়াছেন তিনি তাহাদের প্রথম কাতারে। মুন্সী আঃ লতিফ, মুন্সী আঃ সুবহানও ছিলেন। মুন্সী আফসর উদ্দিন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তবলীগের কাজে অগ্রসর ছিলেন। তারুয়ার হিন্দুদের মধ্যে নিপুনভাবে তবলীগ করিতেন। এই তারুয়ার হিন্দুগণের মধ্যেও অনেকে আহমদীয়ত অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে জানিতেন। বাহিরের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তবলীগ করিতেন। তিনি বেশির ভাগ নামায মসজিদে পড়িতেন। তিনি বা-জামাত ও তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন। তারুয়ার হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন হিন্দু বলিতেন, আমরা মুসলমান হইলে কাদিয়ানী মুসলমান হইব।

মুন্সী আফছর উদ্দিন আমাদের সর্বজন পরিচিত জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি জামাতের খেদমত করিয়া গিয়াছেন। মৌঃ সামসুজ্জামান সাহেবও একই সাথে বয়াত করিয়া ছিলেন তার সাথে। মৌঃ সামসুজ্জামান সাহেব বয়াত নেওয়ার পর বাড়ী হইতে বিতাড়িত হন। ভাইদের দ্বারা নির্মমভাবে উৎপীড়িত হন। তিনি বিতাড়িত হইয়া নাটাই সিকদার রফিকুল্লাহ্ সাহেবের আশ্রয়ে তাহার বাড়ীতে অনেক দিন থাকেন এবং তথা হইতে তা'লীমের জন্য কাদিয়ানে গমন করেন। তিনি অতি উত্তম পর্যায়ের কাঠের কাজ জানিতেন। তিনি ইচ্ছা করিলে দুনিয়াতে অনেক স্বচ্ছলতার সহিত জীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সিলসিলার খেদমতকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় ও ইয়াকীন করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জামাতের তা'লীম-তরবিয়তের কাজ করিয়া গিয়াছেন।

তারুয়ার প্রাথমিক বুযুর্গদের মধ্যে মুন্সী সাহেব আলী সাহেবের বয়াতের পর তিনিও জামাতের খেদমত ও তবলীগের মধ্যে সর্বশক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। তাহাকে মুন্সী মৈজদ্দিন সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন বলা যাইতে পারে। সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য লোকে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। অন্যান্য গ্রামে গিয়া নির্ভীকভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা বর্ণনা করিতেন। তিনি মেহমাননেওয়াজ ছিলেন। জামাতের সাপ্তাহিক মিটিংসমূহে সবসময় উপস্থিত থাকিয়া কথা শ্রবণ করিতেন এবং জ্ঞানসূচক উপদেশসমূহ বাস্তবে রূপদান করিতেন। (চলিবে)

- ডাঃ আহমদ আলী

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক পশ্চিম আফ্রিকা সফরের প্রতিবেদন

(৩য় কিস্তি)

দশম দিন (২২ মার্চ, রোজ সোমবার)

৫-১৫ মিঃ হুযূর আনোয়ার Techiman হাসাপাতালের অঙ্গনে অবস্থিত আহমদী মসজিদে নামায ফজর পড়ান। ৮-১০ মিঃ হুযূর আনোয়ার নিজ অবস্থানস্থল থেকে বাইরে এসে হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তখন ডিস্ট্রিক্ট চীফ এক্সিকিউটিভ হুযূর আনোয়ারের সাথে করমর্দন করেন। হুযূর দন্ডায়মান স্টাফদের সাথেও করমর্দন করেন। Techiman হাসপাতালের সমস্ত বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার, এক্সরে মেশিন, ডিসপেনসারী ও ওয়ার্ডগুলো দেখেন। হুযূর আনোয়ার সাথে সাথে ডাক্তার রশীদ আহমদ ভাট্টি সাহেবের কাছ থেকে এসব বিভাগের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেন। হাসপাতাল পরিদর্শনের পরে হুযূর আনোয়ার হাসপাতাল অঙ্গনে সমাহিত ডাঃ কুদসিয়া খালেদ হাশমী সাহেবা মরহুমার কবরে দোয়া করেন। (মোকাররম ডাঃ খালেদ হাশমী সাহেবের স্ত্রী) এরা উভয় স্বামী-স্ত্রী এ হাসপাতালে ১২ বছর সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর ঘানা সফরকালীন সময় আক্রাতে হুযূর (রাহেঃ)-কে স্বাগত জানিয়ে Techiman ফেরার পথে এক গাড়ী দুর্ঘটনায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ তারিখ ডাক্তার সাহেবা ইন্তেকাল করেন। তাঁকে এখানে সমাহিত করা হয়। তাঁর নামে হাসপাতালের একটি ওয়ার্ড 'কুদসিয়া ওয়ার্ড' রাখা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) যখন নিজে ঘানা সফরে Techiman পৌছেন তখন হুযূর আনোয়ার নিজ বক্তৃতায় ডাক্তার সাহেবা মরহুমার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ডাক্তার সাহেবার মৃত্যুতে যে দুঃখ ও কষ্ট আমি পেয়েছি তা আমার হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আল্লাহ্তাআলা তাঁকে দয়ায় নিমজ্জিত রাখুন। হুযূর আনোয়ার হাসপাতালে নবনির্মিত একটি ভবনের ফলক উন্মোচন করেন।

আহমদীয়া হাসপাতাল টিচিমান-এর সূচনা হয়েছিলো ১৯৭১ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর। এর সূচনা বড়ই ঈমানবর্ধক। হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের কাছাকাছি সময়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ হাসপাতালের কাজ আরম্ভ করার জন্যে মোকারম ডাক্তার বশীর আহমদ খান ঘানা পৌছেছিলেন। কিন্তু এলাকার খৃষ্টান মেডিকেল অফিসার নিজ রিপোর্টে লেখেন-Techiman এ আগে থেকেই দু'টি হাসপাতাল রয়েছে। তাই এ হাসপাতালের গোড়া পত্তনের অনুমতি দেয়া উচিত নয়।

ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েকদিন পরেই সেখানকার একজন ডাক্তার মারা যান। কয়েকদিন পরে অন্য হাসপাতালের ডাক্তার স্বয়ং অসুস্থ হন। সেখানে একটি জরুরী কেসের রোগী এসে গেলো। এতে অপারেশন আবশ্যকীয় ছিল। এ হাসপাতালের কর্মচারীরা রাতে আমাদের ডাক্তার সাহেবের কাছে আসেন এবং রুগীকে অপারেশন করতে বলেন। যেহেতু কাজ করার অনুমতি ছিলো না এজন্যে তিনি অস্বীকার করলেন। কর্মচারীরা অনুনয়-বিনয় করলেন যে, মানুষের মরা বাঁচার প্রশ্ন। খোদার জন্যে আসুন। অতএব ডাক্তার সাহেব এ রুগীর অপারেশন করেন এবং রুগী আল্লাহ্র ফযলে সুস্থ হয়ে যায়। এভাবে স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে আহমদী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ধরা পড়লো। অতএব শীঘ্রই অর্থাৎ ১৯৭১ সনের ২৬ সেপ্টেম্বর যথাযথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাসপাতালের উদ্বোধন হলো।

৮-৫০ মিঃ সময় হুযূর আনোয়ার জামাতের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সালাম বলেন ও দোয়ার সাথে Wa Upper West Region -এর জন্যে রওয়ানা হন। প্রায় ৬ ঘন্টা এক নাগাড়ে এবং ক্লান্তিজনক সফরের পর হুযূর আনোয়ার পৌনে ৩টার সময় Wa মিশন হাউজে পৌছেন। Techiman থেকে Wa যাওয়ার ১৯৫ মাইল দীর্ঘ পথে ৭১ মাইল রাস্তা কাচা আর এতই ধূলা-বালি ছিলো যে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না যে, কোথায় যাচ্ছে। আগের গাড়ীও দেখা যাচ্ছিলো না। আর পিছনের গাড়ীও না। এ ধূলো-বালিতে অনুমান করেই পথ চলতে হয়। পথে ছোট ছোট গর্ত হওয়ার কারণে এত ঝাঁকুনি খেতে হয়েছে যে, খোদাই ভাল জানেন। এ ৭১ মাইলের রাস্তা পাড়ি দিতে প্রায় ৪ ঘন্টা লেগেছে। এ রাস্তা যদি ভাল হতো তাহলে সারাটা সফর ৩ সাড়ে ৩ ঘন্টায় শেষ হতো। হুযূর আনোয়ারের গাড়ী Wa -এর দিকে লক্ষ্য করেই ছুটে যাচ্ছিলো। Wa -এর এলাকায় প্রবেশ করলেই রাস্তার উভয় পার্শ্বে খোদ্দাম ও লাজনা নারায়ে তাকবীর দিয়ে হুযূর আনোয়ারকে স্বাগত জানায়। মিশন হাউসে পৌছতে আরও ২ মাইলের সফর বাকী ছিল। এ সারাটা পথ জামাতের বন্ধুগণ ভিন্ন ভিন্ন দল করে হুযূর আনোয়ারকে খোশ আমদেদ বলতে ছিলেন। রাস্তায় খোশ আমদেদ ও আহলান সাহলান ওয়া মারহাবা-এর ব্যানার টাঙ্গানো ছিল।

মোকাররম ইনায়েতউল্লাহ্ জাহেদ সাহেব, মুবাল্লেগ সেলসেলা, মোকাররম খালেদ মাহমুদ সাহেব, রিজিওনাল সদর, মোকাররম উমর ফারুক ইয়াহ্হিয়া সাহেব, মুবাল্লেগ সিলসিলা এবং Regional Minister Mr. Mogtavi Shahanon হুযূরকে স্বাগত জানান। হুযূর আনোয়ারের গলায় একটি স্কার্ফ পরিয়ে দেন। এতে 'আহলান সাহ্লান ওয়া মারহাবা' লেখা ছিলো। স্নেহের আয়েশা, আনসার আহমদ ও সামার আহমদ হুযূর (আইঃ)-কে ফুলের তোড়া পেশ করে।

হুযূর আনোয়ারের গাড়ী মিশন হাউজে পৌছলে বিপুল সংখ্যক আহমদী সম্বর্ধনার জন্যে উপস্থিত ছিলেন। সকল আহমদী শুভ্র পোষাক পরিহিত ছিলেন এবং নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চারিত করছিলেন। আর 'আহলান সাহলান ওয়া মারহাবা' পাঠ করছিলেন।

হুযূর আনোয়ারের প্রতি খোদ্দামের প্রহরার দৃষ্টির জগত এমন ছিলো যে, যখন তারা দেখলো যে, হুযূরের গাড়ী এসে পড়েছে তখন তারা গাড়ীর দু'পাশ দিয়ে আগেই দৌড়াতে দৌড়াতে আগে গিয়ে হুযূরের গাড়ী মিশন হাউসে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। হুযূর আনোয়ারের সম্বর্ধনার জন্যে লাউড স্পিকারে আহমদীয়ত-জিন্দাবাদ, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস-জিন্দাবাদ ধ্বনি উচ্চকিত করতে ছিলো। হুযূর আনোয়ার লাজনার দিকেও গিয়েছিলেন এবং হাত নেড়ে নেড়ে তাদের উৎসাহী ধ্বনির জবাব দিচ্ছিলেন। Elders যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন হুযূর আনোয়ার তাদেরকে মুসাফাহার সুযোগ দান করেন।

Wa জামাত নিজেদের অতুলনীয় কুরবানীর জন্যে ঘানায় সুপরিচিত। Wa তে আহমদীয়তের বয়াতে সর্বপ্রথম মোহতরম ইমাম সালেহ হাসান সাহেবের নাম আসে। তাঁর খুবই বিরোধিতা হয়েছিলো। প্রাথমিক আহমদীদের শহরে আসা বন্ধ করে দেয়া হয়। তাদেরকে অনেক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। ইমাম সালেহ হাসান সাহেবের পরে ইমাম আব্দুস সালাম ইসহাক সাহেব এবং ইমাম ইয়াহ্ইয়া ওসমানের নাম ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। এরা কঠিন বিরোধিতা সত্ত্বেও জামাতকে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আজ খোদাতাআলা এতই অনুগ্রহ করেছেন যে, Wa তে জামাতই অধিক আর বিরুদ্ধবাদীরা দিন দিন কম হতে যাচ্ছে। এ রিজিওয়নের মন্ত্রীও আহমদী।

হুযূর আনোয়ার ৪-৪০ মিঃ সময় নামায যুহর ও আসর জমা করে পড়ান। এরপরে হুযূর মসজিদ আঙ্গিনার বাইরে মোকাররম ইমাম সালেহ্ আহমদ সাহেব ও অন্যান্য ইমামদের কবরে গিয়ে দোয়া করেন।

৫-২০ মিঃ সময় হুযূর আনোয়ার Wa তে Limanyisi নামক স্থানে নব নির্মিত মসজিদের উদ্বোধন করেন। হুযূর আনোয়ার এর ফলক উন্মোচন করেন। এ মসজিদে ৫শ' লোক নামায আদায় করতে পারবে।

এরপর হুযূর আনোয়ার Wa -এর নিকটবর্তী ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি গ্রামে (Kaleo) গমন করেন। এখানে জামাতের একটি হাসপাতাল অবস্থিত। এ হাসপাতাল ও ডাক্তার সাহেবের বাসভবন একটি ভাড়া করা বাড়ীতে অবস্থিত। এখন আল্লাহ্‌র ফযলে ডাক্তার সাহেবের বাসভবন নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে। হুযূর নির্মিয়মান বাসভবন পরিদর্শন করেন এবং এর ফলক উন্মোচন করেন।

Kaleo তে হুযূর আনোয়ারকে স্বাগত জানানোর জন্যে অন্যান্যদের মাঝে এ এলাকার পার্লামেন্ট মেম্বার ও পার্লামেন্টে বিরোধী দলীয় নেতা Hon. Alban Baglinও উপস্থিত ছিলেন। বন্ধুগণের বেশ সংখ্যক এ সময় এখানে উপস্থিত ছিলেন।

৬-২৫ মিঃ সময় হুযূর আনোয়ার নুসরৎ জাহাঁ টিচার ট্রেনিং কলেজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ১৫ মিনিট সফরের পরে হুযূর আনোয়ার কলেজে পৌছেন। ১৯৭০ সনে নুসরৎ জাহাঁ গার্লস একাডেমী নামে এর প্রথম সূচনা হয়েছিলো। এর প্রথম হেড মিসট্রেস ছিলেন মোকাররম শাকীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী মোবারেকা নাঈমা শাকীল সাহেবা। ১৯৮২ সনে ঘানা সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী জামাতে আহমদীয়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজ খোলে। এ স্কুলকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর অনুমতিক্রমে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পরিবর্তন করা হয়। ঘানাতে এটাই প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুসলিম ট্রেনিং কলেজ। এ কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন মোকাররম মাসউদ আহমদ শামস্ সাহেব। ১৫০ একর জমির ওপরে এ কলেজ অবস্থিত। হুযূর কলেজের এক স্থানে ফলক উন্মোচন করেন ও দোয়া করেন।

হুযূর আনোয়ার কলেজ পরিদর্শনও করেন। আর আব্দুস সালাম লাইব্রেরীও দেখেন। কলেজের একটি ব্লকের নাম 'নাঈমা ব্লক'। হুযূর কলেজের নির্মিয়মান লেবরেটরীজও দেখেন। হুযূর কলেজের কম্পিউটার সেকশনের পূর্ণতার জন্যে ২০টি কম্পিউটার দিতে নির্দেশ দেন। তদুপরি রিজিওনাল মন্ত্রীকে শীঘ্র এটা পরিপূর্ণ করার জন্যে এবং একে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্যে বলেন। হুযূর কলেজের মসজিদও পরিদর্শন করেন। এটা ঘানাতে আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুলগুলোর মাঝে তৈরী প্রথম মসজিদ। হুযূর আনোয়ার কলেজের পরিদর্শন বইতে লেখেন ঃ "কলেজের উন্নতির ধারা অসাধারণ। আল্লাহ্‌তাআলা প্রিন্সিপাল ও স্টাফকে নিজেদের পরিপূর্ণ যোগ্যতার সাথে প্রতিষ্ঠানের সেবা করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।"

সকল ছাত্র ও শিক্ষক এক স্থানে জামায়েত ছিলেন। হুযুর আনোয়ার সেখানে পৌছলে ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কোরাসের আকারে পড়েন এবং লাউডস্পিকারের মাধ্যমে গগণচুম্বী নারা লাগান। হুযূর আনোয়ার হাত নেড়ে তাদের প্রেমপূর্ণ ধ্বনির জবাব দেন।

মাগরিব ও ইশার নামায পড়ার পরে হুযূর আনোয়ার রিজিওনাল মিশনারীদের পক্ষ থেকে দেয়া সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান। রিজিওনাল মন্ত্রী ও জেলা পর্যায়ের বিভাগগুলোর কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের সম্ভ্রান্ত চিন্তাবিদগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। হুযূর আনোয়ারের দোয়ার মাধ্যমে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এরপর রিজিওনাল মন্ত্রী হুযুর আনোয়ারকে ঘানা ও বিশেষ করে আপার ওয়েষ্ট রিজিওন-এর পক্ষ থেকে খোশ আমদেদ (অভ্যর্থনা) জানান, তিনি বলেন ঃ

"আমাদের রিজিওনের উন্নতি ও অগ্রগতিতে জামাতে আহমদীয়া আমাদের অংশীদার। জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা বিভাগে কৃত সেবায় লোকদের অশেষ উপকার হয়েছে। আমরা এতে জামাতে আহমদীয়ার অশেষ শোকরগুযারী করছি"।

তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের ক্ষেত্রে রিজিওন যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে এ বিভাগের আরও সাহায্যের আবেদন করেন আর ডাক্তারদের সংখ্যাও অপ্রতুল বলে জানান। শেষে হুযূর আনোয়ার এ অনুষ্ঠানের সকল মেহমানকে এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্যে শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন। হুযূর আনোয়ার প্রত্যেক মেহমানের কাছে যান এবং রিজিওনাল মন্ত্রী হুযূরের সাথে সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন। এ অনুষ্ঠান ৮-৪০ মিঃ পর্যন্ত চলে। এরপরে হুযূর আনোয়ার Wa মিশন হাউসে তাঁর অবস্থানস্থলে ফিরে আসেন।

এগারতম দিন (২৩ মার্চ, রোজ মঙ্গলবার)

৮-৪০ মিঃ সময় হুযূর আনোয়ার বিভিন্ন পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেন। সাক্ষাতের কাছাকাছি সময়ে হুযূর Umar Kyieniche নামক এক নিষ্ঠাবান আহমদীর জানাযার নামায পড়ান। এ গোষ্ঠী এলাকায় মূর্তি পূজারী ছিলো। তিনি গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। যখন তার কাছে আহমদীয়তের সত্যতা ধরা পড়লো তখন তিনি নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে আহমদীয়ত গ্রহণ করে নেন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এতে সুদৃঢ় ছিলেন।

পরে হুযূর আনোয়ার (আইঃ) Temale -এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ১০-৫০ মিঃ সময় Sawla নামক স্থানে পৌছেন। সেখানকার রাস্তা পাক্কা।

এরপরে ১২৮ মাইল কাচা রাস্তা। ধূলো-বালিতে কাফেলা গোসল করে ফেলেছে। ২-৫০ মিঃ সময় হুযূর রিজিওনাল সদর-এর বাস ভবনে পৌছেন। সেখানে জামাতের বিপুল সংখ্যক বন্ধুদের সমাবেশ ছিলো। নারায়ে তকবীরের মাধ্যমে তারা হুযূর আনোয়ারকে স্বাগত জানান। দু'টি শিশু হুযূর আনোয়ারকে ফুলের তোড়া উপহার দেয়। মোকাররম আব্দুল হামীদ মীর সাহেব, মুবাল্লেগ সিলসিলা নর্দান রিজিওন এবং মোকাররম নুরুদ্দীন মু'মিন সাহেব, রিজিওনাল সদর হুযূর আনোয়ারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

৪-৩০ মিঃ সময় হুযূর আনোয়ার নামাযের জন্যে আহমদীয়া মসজিদে পৌছেন। এটি দ্বিতল মসজিদ। এর নিচের তলা নির্মিত হয়েছে আর ওপরের তলার কাজ চলছে। হুযূর আনোয়ার নির্মিত অংশের ফলক উন্মোচন করেন এবং দোয়া করেন। যুহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান। হুযূর আনোয়ার নির্দেশ দেন যেন দ্বিতীয় তলা ৬ মাসের মধ্যে নির্মিত হয়ে যায়। এ মসজিদে ৪ হাজার নামাযীর জন্যে ব্যবস্থা রয়েছে। এ মসজিদ নির্মানে মোকাররম ডাক্তার ইউসুফ এডোসনি সাহেব এবং মোকাররম আল্‌হাজ্জ বি, এ, বোনসু সাহেব অসাধারণ সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। হুযূর মসজিদ পরিদর্শন করে বলেন ঃ

"যখন আমি এখানে থাকতাম তখন এটা চিন্তাও করা যেতোনা যে, এখানে এত বিশাল মসজিদ তৈরী হতে পারে"

হুযূর সিলসিলার মুবাল্লেগের অফিসও দেখেন। এরপর Temale মিশন হাউজে গমন করেন।

Temale থেকে ৪৫ কিঃ মিঃ দূরে একটি গ্রাম রয়েছে। সেখানে হুযুর আনোয়ারের Temale -তে অবস্থানকালীন সময়ে ২৫০ একর জমিতে অবস্থিত

জামাতের কৃষি খামারের তত্ত্বাবধায়ন করেছেন। হুযূর আনোয়ার এখানে জোয়ার ও ধানের চাষ করেন। তদুপরি ৪ একর জমিতে গম উৎপাদনের সফল পরীক্ষা করেন। হুযূর আনোয়ার এ সময় Temale অবস্থান কালে এ বাড়ীতে ২ বছরের অধিক সময় কাটান। এ বাড়ী আজকাল রিজিওনাল এডুকেশন দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। হুযূর আনোয়ার প্রত্যেক দিন Temale থেকে কৃষি কাজের তত্ত্বাবধানের জন্যে যেতেন।

এরপর হুযূর আনোয়ার মিশন হাউজে গমন করেন। মাগরিব ও ইশার নামাযের পরে হুযূর আনোয়ার Temale-এর আহমদীদের সাথে খোলা-মেলা কথাবার্তা বলেন। অনেক আহমদীর নাম হুযূর আনোয়ারের বেশ স্মরণ ছিলো। হুযূর তাদের ডাকেন, তাদের খবরা - খবর নেন। হুযূর আনোয়ার তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারীদের ওপরে খুব খুশী হন। আনন্দ তাদের মুখাবয়বেও ফুঁটে উঠেছিলো।

বারতম দিন (২৪ মার্চ, রোজ বুধবার)

হুযূর আনোয়ার Temale -তে ফজরের নামায পড়ান। পরে ইজতেমায়ী দোয়া করে Selaga -এর দিকে রওয়ানা করেন।

যখন হুযূর আনোয়ারের গাড়ী টি.আই আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুল Selaga পৌছে তখন পথের দু'ধারে ছাত্র-ছাত্রীরা সারিবদ্ধ হয়ে নারায়ে তকবীর ও আহলান সাহলান মারহাবাম বিকুম-এর সাথে হুযূর আনোয়ারকে স্বাগত জানায়। এখানকার মাষ্টার মোকাররম ইয়াকুব আবূ বকর সাহেব (ইনি জামেয়া আহমদীয়া ঘানা থেকে পড়াশুনা করে বের হয়েছেন) হুযূর আনোয়ারকে সম্বর্ধনাস্বরূপ স্কার্ফ পরিয়ে দেন আর স্নেহের সালমা ফুলের তোড়া উপহার দেন। এ স্কুল এ দিক থেকে সৌভাগ্যবান যে, এখানে আমাদের প্রিয় নেতা নিজের ঘানা অবস্থানকালীন ১৯৭৭ সনের আগষ্ট থেকে ১৯৭৯ সনের আগষ্ট পর্যন্ত প্রিন্সিপাল ছিলেন। ক্যাডেট কোর হুযূর আনোয়ারের সম্মানে গার্ড অব অনার পেশ করে। হুযূর আনোয়ার নির্মিত মসজিদেও গমন করেন। আর এর ফলক উন্মোচন করেন।

হুযূর আনোয়ার হেড মাষ্টারের অফিসে গমন করেন এবং পরিদর্শন বইতে নিম্নোক্ত মন্তব্য লেখেন ঃ

"এ স্কুলটি অনেক উন্নতি করেছে। আল্লাহ্তাআলা এ স্কুলটিকে অনেক উন্নতি দিন। মোকাররম ইয়াকুব আবূ বকর সাহেব হেড মাষ্টারকে সাহায্য করুন। আল্লাহ্তাআলা স্টাফ ও ছাত্রছাত্রীদের পরিশ্রম করার সৌভাগ্য দিন আর স্কুল থেকে জাতির বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান নাগরিক ও নেতা সৃষ্টি করুন। আল্লাহ্তাআলা এদের সবার প্রতি অনুগ্রহ করুন যারা এ স্কুলের উন্নতির জন্যে নিবেদিত আত্মা নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছেন।"

হুযূর আনোয়ার প্রশাসনিক ভবনের সামনে একটি আমের চারা রোপণ করেন। ছাত্র - ছাত্রীদের হোষ্টেল পরিদর্শন করে এগুলো সংস্কারের নির্দেশ দেন। হুযূর হেড মাষ্টারের বাসায়ও গমন করেন। এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আমার এটা রীতি নয় যে, আমি ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলি; কিন্তু এখন আমি আপাদেরকে এ জন্যে উদ্দেশ্য করে বলছি যে, এ স্কুলের সাথে আমার আবেগাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। এটা সেই স্কুল যেখানে ঘানায় আসার পর আমার প্রথম নিযুক্তি হয়েছিলো। আর আমি এ স্কুল থেকে পড়ানো শুরু করি। হুযূর ছাত্রদেরকে লেখা পড়ার প্রতি গাম্ভির্যের সাথে দৃষ্টি দেয়ার উপদেশ দেন। তদুপরি দুর্বল ছাত্রকে আহমদী হওয়ার কারণে মন দিয়ে পড়াশুনার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, ধর্মীয় জ্ঞানে উন্নতি করুন আর উত্তম নাগরিকে পরিণত হোন। হুযূর আশা প্রকাশ করেন, এ স্কুল থেকে ভবিষ্যত নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে।

এরপর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) Selaga-এর সেই ঘরেও যান যেখানে হুযূর আনোয়ার এখানে থাকাকালীন দু'বছরের অধিক অবস্থান করতেন। দু'টি ছোট ছোট কামরা ছিলো। ছোট একটি রান্না ঘর এবং কয়েক ফুটের একটি গোসলখানা। যখন হুযূর এখানে থাকতেন তখন এখানে বিদ্যুৎও ছিলো না।

হুযূর এখানকার চীফ সাহেবের ঘরেও গমন করেন। চীফ সাহেব এলাকার সবার পক্ষ থেকে হুযূর আনোয়ারকে খোশ আমদেদ জানান। আর বলেন, আমরা আনন্দিত যে, Selaga-তে আমাদের সাথী আজ আন্তর্জাতিক ধর্মের নেতা হয়েছেন। তিনি হুযূর আনোয়ারের নিকট দোয়ার আবেদন করেন। চীফ সাহেব হুযূর আনোয়ারকে একটি ঐতিহ্যবাহী গাউন (Smock) পরিয়ে দেন। হুযূর আনোয়ার চীফ সাহেবের শোকরিয়া আদায় করেন এবং দোয়া করার পর Temale ফিরে যান। Temale পৌছে ৪-৪৫ মিঃ সময় হুযূর আনোয়ারের সাথে নর্দান রিজিওনের নতুন আহমদী চীফ সাহেবান ও নতুন আহমদীদের সাক্ষাৎকারের প্রোগ্রাম ছিলো।

তেলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে প্রোগ্রামের সূচনা হয়। রিজিওনাল সদর সাহেব তাঁর স্বাগত ভাষণে তার রিজিওনের বন্ধুদের পক্ষ থেকে হুযূর আনোয়ারকে খোশ আমদেদ জানান। আর বলেন, আমাদের আনন্দের পরিসীমা নেই যে, আমরা আপনাকে খলীফারূপে পেয়ে আপনার সাথে মিলিত হচ্ছি। তিনি বলেন, এ রিজিওনের লোকেরা হুযূরের সেই সব কুরবানীর কথা ভালভাবে স্মরণ করে যখন হুযূর সেলাগার টি. আই আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুলের প্রিন্সিপাল থাকাকালীন সেবা করেছিলেন। এটা এমন এক স্থানে ছিলো যেখানে পানি ছিলো না, বিদ্যুৎ ছিলো না, আকর্ষণীয় কোন স্থান ছিলো না। এমতাবস্থায় কেবল কুরবানীর আত্মা নিয়েই সেবা করা যেতে পারে। তিনি বলেন, এখন নর্দান রিজিওনে বিপুল হারে বয়াত হচ্ছে।

হুযূর আনোয়ার নিজ সংক্ষিপ্ত ভাষণে বন্ধুগণের শোকরিয়া আদায় করেন। আর বলেন, আপনারা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্তাআলা আপনাদেরকে মসীহে মাওউদ ও মাহ্দীয়ে মা'হূদকে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন। অতএব এ বাণী অন্যদের নিকট পৌছানো আপনাদের অবশ্য কর্তব্য। কেননা, হাদীসে এসেছে, যে জিনিস নিজের জন্য পসন্দ করো তা অন্যদের জন্যেও পসন্দ করো। হুযূর বলেন, আমি আশা করি, আমি দ্বিতীয়বার যখন আসবো গোটা রিজিওনে যেন আহমদীয়তের পতাকা উড়তে দেখি।

হুযূর (আইঃ) মসজিদ নির্মাণের ওপরে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, Temale তে অতি বিরাটকায় ও মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ নির্মিত হয়ে গেছে। কয়েক বছর পূর্বে এর চিন্তাও করা যেতো না। মুত্তাকী লোকদের দিয়ে ভরে দেয়া আপনাদের অবশ্যই কর্তব্য। বরং এ মসজিদ লোকদেরকে দ্বারা যেন নাচতে থাকে। হুযূর আনোয়ার নর্দান রিজিওনের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত চীফ সাহেবান ও ইমামদের সাথে মোসাফাহা করেন।

হুযূর আনোয়ার এরপরে দীর্ঘ সময় ধরে চিঠি-পত্র দেখেন। পরে মজলিসে আমেলার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এবং মোকাররম আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে হুযূর আনোয়ারের সমীপে সফরের ছবি উপস্থাপন করা হয়। এরপর হুযূর আনোয়ার ঘানার আমীর ও ৩ জন নায়েব আমীর-এর সাথে বৈঠক করেন। নামাযের পরে হুযূর (আইঃ)-এর পবিত্র হাতে দু'ব্যক্তি বয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর হুযূর নিজের অবস্থানস্থলে চলে যান। (চলবে)

(৮-৪-২০০৪ তারিখের আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল এর সৌজন্যে)

অনুবাদ-মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক আয়োজিত ২৯ মে তারিখের সাংবাদিক সম্মেলন

(প্রেস রিলিজ)

সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ,

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

গত ২০০৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে আহমদীয়া বিরোধী যে আন্দোলন শুরু হয়েছে এর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

- কুষ্টিয়া জেলার উত্তর ভবানীপুরের ১৭টি আহমদী পরিবারকে স্থানীয় দুই মাওলানার ফতোয়ার প্রেক্ষিতে প্রায় একমাস অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। তাদের চলাচলে, হাট-বাজারে, মাঠে-ঘাটে, এবং স্কুল-কলেজে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়া হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার আগেই পার্শবর্তী একটি জেলা যশোরের ঝিকরগাছা থানাধীন রঘুনাথপুর বাঁক গ্রামে একদল ধর্মীয় সন্ত্রাসী প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে স্থানীয় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম জনাব শাহ্ আলমকে। শহীদ শাহ্ আলমের খুনের বিষয়ে সেই দিনই ১৬ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে স্থানীয় থানায়। এর প্রধান দুই আসামী হলেন মৌলবী আমিনুর ও জনৈক শাহীন। মৌলবী আমীনুর জামাতে ইসলামীর সক্রিয় সদস্য বলে আমরা স্থানীয় সূত্র ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। আজ পর্যন্ত প্রধান আসামীদের ধরার ব্যবস্থা করা হয়নি।
- রঘুনাথপুর বাঁকের এই জঘন্য হত্যাকান্ডের কোন সুরাহা হওয়ার আগেই ঢাকার নাখালপাড়াস্থ আহমদীয়া মসজিদ অভিমুখে বার বার আক্রমণ চালানো হয়। প্রকাশ্য আগাম ঘোষণা দিয়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক বক্তব্য রেখে এসব জঙ্গী মিছিল করা হয় এবং মসজিদ অভিমুখে আক্রমণ করা হয়।
- এই অন্যায় বিহিতকল্পে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। একাধারে এই সমস্ত অন্যায়, অবিচার ও নির্যাতনের পর অকস্মাৎ একটি সরকারী ঘোষণা আমাদের হতবাক করে দিয়েছে! বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত সংবাদে আহমদীয়া জামাতে সকল প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এই দিনে একই মন্ত্রণালয় থেকে আহমদী জামাত কর্তৃক প্রকাশিত দশটি বই এবং দশটি লিফলেট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে! কিন্তু এ দু'টি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত এই বিষয়ে সরকারের অস্বচ্ছ নীতিকেই সাব্যস্ত করছে। আরো কথা রয়েছে, আর তা হলো আজ পর্যন্ত সরকারের প্রকাশনা নিষিদ্ধকরণ এই সিদ্ধান্ত কোন গেজেটে প্রকাশিত হয়নি। গেজেটে প্রকাশ না করে সরকার নিজের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে ব্যস্ত। বিবিসি রেডিওর ইন্টারভিউতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোর্শেদ খান বলেছেন, গেজেটে এ বিষয়ে কোন কথাই নেই। কিন্তু সরকারের এই রাজনৈতিক মার প্যাঁচে নিরীহ আহমদীদের ওপর অত্যাচার কিন্তু থেমে থাকেনি বরং এতে সংযোজিত হয়েছে এক নতুন মাত্রা। বিভিন্ন গ্রামে-মফঃস্বলে নিরীহ-গরীব আহমদীদেরকে আতংকিত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ত্রাসের রাজত্ব। ধর্মীয় সভা-সমিতির নামে লাঠি-সোটাসহ জঙ্গী মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। যে সকল স্থানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলো হলো ঃ

- বরগুণা জেলার আমতলী থানাধীন খাকদান।
- পঞ্চগড়ের সদর থানাধীন আহমদনগর গ্রাম।
- রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানাধীন দলপাড়া, ধর্মপুর, কাজিপাড়া এবং বড় শিবপুর গ্রাম।

শেষোক্ত চারটি গ্রামে আহমদীদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালানোর পাশাপাশি বাড়ি-ঘর ভাংচুর এবং লুটতরাজের ঘটনাও ঘটে।

সুপ্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

গত ১৬ এপ্রিল ঢাকার নাখালপাড়ায় উগ্র ধর্মান্ধরা কয়েকশ' লোকের একটি জঙ্গী সমাবেশ করে আহমদীয়া মসজিদ অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করে। এই সমাবেশকে ফিরিয়ে না দিয়ে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের অন্যায় আবদার বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে (১৬ই এপ্রিল, ২০০৪ চ্যানেল আই-প্রদর্শিত সংবাদ)।

মাত্র কয়েকশ' উগ্র ধর্মান্ধের উস্কানীমূলক বক্তব্যে প্রশাসন কিভাবে চাপের মুখে পড়ে তা আমাদের বোধগম্য নয়। ইউনিফরম পরিহিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো গেজেট নোটিফিকেশন ছাড়া এবং কোন ওয়ারেন্ট ছাড়াই কিভাবে এবং কেন আহমদীয়া মসজিদে প্রবেশ করলো সেটাও এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরো মজার ব্যাপার হলো, আহমদীয়া মসজিদ থেকে পবিত্র কুরআন ও বোখারী শরীফ উদ্ধার করে পুলিশ তা সরাসরি কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তুলে দেয়নি বা হস্তান্তর করেনি বরং তা তুলে দিয়েছে আন্দোলনকারী উগ্র-ধর্মান্ধদের হাতে। প্রশ্ন হলো, পুলিশ কার পক্ষে কাজ করছিলো? প্রশাসনের নাকি উগ্র-সাম্প্রদায়িক অপশক্তির? সরকারের এই দুর্বলতা কেন? ধর্মান্ধদের কাছে সরকার কি ইতোমধ্যে জিম্মি হয়ে গেছে?

শ্রদ্ধেয় সাংবাদিকবৃন্দ,

১৬ই এপ্রিলের পর উগ্র মৌলবাদী চক্রের আরো একটি তান্ডবলীলা অনুষ্ঠিত হয় পটুয়াখালী সদরে। দিনটি ১২ মে বুধবার। পটুয়াখালী জেলার এডিসি নিজে এসে আহমদীয়া মসজিদ থেকে কুরআন শরীফ এবং হাদীসের কপি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যান। এতেও উগ্র-ধর্মান্ধরা সন্তুষ্ট হয় নি। শেষে এডিসির পক্ষ থেকে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার আহমদীয়া জামাত, পটুয়াখালী-এর মসজিদে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখে যান। এই সাইনবোর্ডে লেখা আছে, 'পটুয়াখালীস্থ কাদিয়ানী উপাসনালয়, কোন মুসলমান মসজিদ মনে করে ধোঁকায় পড়বেন না।' আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নিজস্ব সম্পত্তিতে ইবাদতের জন্য গড়ে তোলা হয় আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ। এতে উগ্র-সাম্প্রদায়িক অপশক্তির পক্ষ থেকে প্রশাসনের সাইনবোর্ড ঝুলানো গোটা রাষ্ট্র-যন্ত্র এবং প্রশাসনের ভূমিকাকেই বিতর্কিত করে তুলেছে।

গভীর উদ্বেগের সাথে সর্বশেষ যে ঘটনাটি আমরা উল্লেখ করতে চাই, সেটি গতকাল চট্টগ্রামে মহানগরীতে ঘটেছে। একই উগ্র-সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠী ধর্ম রক্ষার জিগির তুলে চকবাজারস্থ আহমদীয়া মসজিদ অভিমুখে জঙ্গী মিছিল বের করে। মিছিলটিকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মসজিদের

কাছাকাছি একটি স্থানে থামিয়ে দেন আর তাদেরকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তা বহন করে আহমদীয়া মসজিদ কমপ্লেক্সের গেটে মৌলবাদীদের তৈরী করা একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেন। ঘটনার রেকর্ডিং প্রত্যক্ষ করুন (রেকর্ডিং দেখানো হয়)।

আমাদের প্রশ্ন, কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সরকারের এই নতজানু নীতি? চিহ্নিত হাতে গোনা সেই কয়েকজন মানুষকে যারা নাখালপাড়ায় উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে তাদের জন্য? এই ক'জনই আবার পটুয়াখালীতে গিয়ে উস্কানী দিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করেছে। সরকার কি জানেন না সেই চিহ্নিত কয়েকজন লোকই গত এক সপ্তাহ ধরে চট্টগ্রাম অঞ্চল সফর করে লোক জড় করেছে? সেই একই চিহ্নিত চক্রকে বার বার সন্তুষ্ট করতে সরকার এত উদগ্রীব কেন? নাকি এসব সাজানো ও ভয়ংকর নাটকগুলোর পেছনে আরো কোন গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে?

আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধবাদীদের এত সব কর্ম-কান্ড সত্বেও সরকারের নীরবতা আমাদেরকে বিস্মিত করেছে। কয়েকজন মন্ত্রী মহোদয়ের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বিষয়টিকে অস্পষ্ট করে তুলেছে। এই বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট অবস্থান, নীতি ও বক্তব্য জানতে আমরা মাননীয় সরকার প্রধানের কাছে ইতোমধ্যে দু'বার লিখিত আবেদনের মাধ্যমে এবং একাধিকবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিনীত আবেদন জানিয়েছি। আমরা সেই আবেদনগুলোর উত্তর পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান।

দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়-বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে সরকারের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, দয়া করে আমাদের নাগরিক, সাংবিধানিক, মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করুন। ইমাম শাহ্ আলম হত্যাকান্ডের সুবিচার নিশ্চিত ও তরান্বিত করুন। আমাদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ বিষয়ক সিদ্ধান্ত দয়া করে প্রত্যাহার করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর পক্ষে।

অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী
নায়েব ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

রাজশাহী বিভাগীয় ৬ষ্ঠ বার্ষিক ওয়াকফে নও তা'লীম তরবিয়ত ক্লাস ও সম্মেলন-২০০৪ অনুষ্ঠিত

রাজশাহী উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহ নিয়ে রাজশাহী রিজিওন ১-এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক ওয়াকফে-নও তালীম তরবিয়তি ও ক্লাস ও সম্মেলন-২০০৪ইং আহমদনগর মসজিদে গত ২০/০৫/২০০৪ইং থেকে ২৪/০৫/২০০৪ইং পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন জামাতের ৪৭ জন ওয়াকফে-নও মোজাহিদ উপস্থিত ছিল। বেশ কয়েকজন পিতা-মাতাও যোগদান করেন। পাঁচ দিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠানের খাকসার উদ্বোধন করে রাজশাহী বিভাগীয় ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী হিসেবে। সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন মুহতরম মসীহ্-উর রহমান, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সর্বজনাব মাওলানা বশিরুর রহমান, মোয়াল্লেম আব্দুস সালাম, মোয়াল্লেম জাকির হোসেন, মোয়াল্লেম কামরুল ইসলাম প্রধান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং তাদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। স্থানীয় জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মহী উদ্দীন অনুষ্ঠান চলাকালীন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

রাজশাহী দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহ নিয়ে রাজশাহী রিজিওন-২ এর ওয়াকফে নও তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস ও সম্মেলন-২০০৪ইং বগুড়া মসজিদে ২৭/০৫/২০০৪ থেকে ৩১/০৫/০৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মসীহ্ উর রহমান, ন্যাশনাল ওয়াকফে নও এবং সমাপনী অধিবেশনের দায়িত্ব পালন করেন রাজশাহী বিভাগীয় ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী। শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সর্বজনাব মাওলানা আব্দুল মতিন, মোয়াল্লেম আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম মোজাফ্ফর আহমদ, মোয়াল্লেম মজিদুল ইসলাম ও মোয়াল্লেম এহতেশামুল বশীর আহমদ। বিভিন্ন জাতের পিতা-মাতাও এতে শরীক হন। কুরআন শিক্ষা, উর্দূ (পঠন ও কথন) হাদীস, দোয়া, দীনি মা'লুমাত, আরবী গ্রামার (তাজবীদ) ইত্যাদির উপর উভয়স্থানে নির্বাচিত শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ দান করেন। ক্লাসের পর ওয়াকফে-নও মোজাহিদগণের উল্লেখিত বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয় এবং অন্যদেরকে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। দোআর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ সম্পন্ন হয়। রাজশাহী-২ এর অনুষ্ঠানে স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব মজিদুল ইসলাম অত্যন্ত পরিশ্রম করেন।

- অধ্যাপক রাজিব উদ্দীন আহমদ
বিভাগীয় ওয়াকফে-নও সেক্রেটারী

১৩তম আতফাল দিবস ও মাতাপিতা দিবস উদ্‌যাপন

মজলিস আতাফালুল আহমদীয়া, ঢাকার উদ্যোগে গত ২০ ও ২১ মে, ২০০৪ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ১৩তম আতফাল ও মাতাপিতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। এতে মোট ৩৪ জন আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

২০ মে, ২০০৪ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আসর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আমীর সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকা, মোহতরম নায়েব কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকা, মোহতরম মুরব্বী আতফাল, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকা; মোহতরম নায়েম আতফাল, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০ জন আতফাল এবং বেশ কিছু সংখ্যক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। বাদ মাগরিব বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মূল কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা, কুইজ, স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা ও বিভিন্ন খেলাধূলা উল্লেখযোগ্য।

২১ মে, ০৪ বাদ জুমুআ মাতাপিতা দিবস ও আতফাল দিবসের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। মাতাপিতাদের প্রতি নসীহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন মোকাররম মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এরপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ, মোহতরম আমীর সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকা, মোহতরম

সদর সাহেব, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ, মোহতরম নায়েব কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকা; মোহতরম মুরব্বী আতফাল, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা এবং মোহতরম নায়েম আতফাল, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকা।

এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। সব শেষে দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আবুল আতা (মামুন)
নায়েব আতফাল

আতফাল দিবস এবং মাতাপিতা দিবস পালন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তাহেরাবাদের উদ্যোগে গত ২১/৫/০৪ইং বাদ ফযর হতে বাদ জুমুআ পর্যন্ত আতফাল দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৮ জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য ৬ জন খোদ্দাম ও সম্মানিত কায়েদ সাহেব ও প্রেসিডেন্ট সাহেব উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে জুমুআর নামাযের পর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে দোয়া করে উক্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

কায়েদ

সারা দেশের জামাতগুলোতে খিলাফত দিবসের সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত

২৭শে মে আহমদীয়তের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। এদিন ঐশী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ইসলামে দ্বিতীয় বার খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর তিরোধানের পর আল্হাজ্জ হাফেয হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর খিলাফতের মসনদে আসীনের মাধ্যমে। বর্তমানে এ খিলাফতের পঞ্চম পর্যায় চলছে।

এদিন সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের জামাতগুলোতে শান-শওকত ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে এ দিনের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও কল্যাণের কথা আর একবার স্মরণ করানোর জন্যে সভা-সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এ পর্যন্ত যেসব জামাত ও সংগঠন থেকে খবর পাওয়া গেছে তারা হলেন ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা, সুন্দরবন, ক্রোড়া, তেবাড়িয়া, চরসিন্দুর, তেরগাতি, হোসনাবাদ, কুমিল্লা ও লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা।

- নিজস্ব সংবাদদাতা

ক্যালগেরীতে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর ওপরে সেমিনার

আল্লাহ্তাআলার খাস ফযল ও রহমতে Voice of Islam আহমদীয়া মুসলিম জামাত ক্যালগরী কর্তৃক আয়োজিত Life & death of Jesus Christ সেমিনার গত ২৪/০৩/২০০৪ তারিখে ক্যালগরী University M.F হলে পূর্ণ কামীয়াবীর সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আহমদী মুসলমান অ-আহমদী মুসলমান ইহুদী খৃষ্টান ছাত্র-ছাত্রী অতি আগ্রহের সাথে সেমিনারে যোগদান করে। হল কানায় কানায় ভরা ছিল তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না; এমন কি অনেককে ফ্লোরে বসে ও দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে দেখা গেছে। National Ameer and Missionary Incharge মহতরম নাসিম মাহ্দী বিশেষ কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে মাওলানা মোবারক নজির সাহেব বক্তব্য পেশ করেন। খৃষ্ট ধর্মের পক্ষ থেকে জনাব Rev. Tom Melvin (Minister of Midland's United Church) বক্তব্য পেশ করেন। প্রোগ্রাম তত্বাবধানে CBC।

অনুষ্ঠানে সবচেয়ে উপভোগ্য ছিল অনুষ্ঠান শেষে প্রশ্নোত্তর সভা। অধিক সংখ্যক Arabian students খৃষ্টান ইহুদী শ্রোতা ঈসা (আঃ)-এর পরবর্তী জীবনের উপর প্রশ্ন করেন ও বিরোধিতা করেন। কিন্তু Moderator এর হস্তক্ষেপে সভা সুন্দরভাবে সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে দেশীয় ও এশীয় স্টাইলে মিষ্টি সমোছা ও ড্রিঙ্কস আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

সংবাদদাতা - ন. ন. মোহাম্মদ সালেক

শুভ বিবাহ

❐ জনাব আব্দুল ওয়াহেদ লস্কর-এর কন্যা মোসাম্মাৎ তাসমিনা আক্তার, সাং- ঘাটুরা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিয়ে জনাব লতিফুর রহমান-এর পুত্র জনাব আজিজুর রহমান (লিপু), সাং-কান্দিপাড়া, উত্তর আহমদী পাড়া, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৬/০৩/০৪ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়াস্থ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব আলহাজ্জ শেখ মোশাররফ হোসেন, বিভাগীয় সেক্রেটারী, রিশ্তানাতা। ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৪৩৩/০৪ তারিখ ১৬/০৪/০৪।

❐ জনাব হাফেজ মোহাম্মদ সেকান্দর আলী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ দিলোয়ারা বেগম তানিয়া, সাং- ২/১, নাসিম বাগ, মীরপুর-২, ঢাকা-এর বিয়ে জনাব আলহাজ্জ শাহ্ মোহাম্মদ সোলায়মান-এর পুত্র জনাব আমিনুল ইসলাম ফজল, বি-১৬২, রোড-২৩, নিউ ডি ও এইচ এস, মহাখালী, ঢাকা-এর সাথে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৬/০৪/০৪ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকাস্থ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্। ন্যাশনাল রিশ্তানাতার দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন নং ০৪৩৪/০৪ তারিখ ২২/০৪/০৪।

এসব বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ

AI INDEX: ASA 13/005/2004 23 April 2004

Bangladesh
The Ahmadiyya Community - their rights must be protected

1. Introduction

Members of the "Ahmadiyya Muslim Jamaat", a religious community which considers itself a sect of Islam, has been the target of a campaign of hate speech organized by a number of Islamist groups in the country in recent months.(1)

These groups have mobilised crowds to chant anti-Ahmadiyya slogans, have sought confiscation of Ahmadi mosques, and have demanded that the government declare the sect non-Muslim. Members of the Ahmadiyya community in Bangladesh, about 100,000 in number, have been living in fear of attack, looting and killing since around October 2003 when the Anti-Ahmadi agitations began.

The agitators have been involved in "excommunication" and illegal house arrest of Ahmadis, the killing of an Ahmadi Imam (preacher), beating of Ahmadis, and marches to occupy Ahmadi mosques.

While the Government of Bangladesh has acted to prevent the crowds from entering Ahmadi mosques, it has taken no action against the perpetrators of the hate campaign. Fundamental rights of the Ahmadis have been further violated by a government ban on their publications.

Amnesty International is urging the Government of Bangladesh to ensure the safety and security of the Ahmadiyya community; uphold its members' right to practice their religion without fear of persecution; lift the ban on their publications; and ensure that those responsible for attacks against Ahmadis are brought to justice.

2. "Excommunication" and illegal house arrest of Ahmadi villagers

On 21 October 2003, an estimated 100 people including women and children belonging to 17 Ahmadi families in the village of **Uttar Bhabanipur** in Kushtia District were declared "excommunicated" by a local Islamist leader opposed to the Ahmadis. Under his edict, Ahmadis were forbidden from buying or selling goods in their village, from harvesting their crop, from talking to each other in the presence of other villagers, and from sending their children to school. They were effectively held under illegal house arrest with anti-Ahmadi Islamist activists enforcing the edict. Their plight ended after about 25 days when the Home Ministry intervened following intense lobbying of the ministry by leaders of the Ahmadiyya community. However, no one has been brought to justice for these illegal acts.

3. Killing of an Ahmadi preacher

Shah Alam, the Imam of a local Ahmadi mosque in the village of **Raghanathpur Bak** in Jessore District was beaten to death on 31 October 2003. He was killed in front of his family by a crowd of some 90 men led by a local Islamist leader. They attacked him because he did not yield to their demand to recant his Ahmadiyya faith. During this attack, two other members of the community were severely beaten and injured. A First Information Report - FIR, which is required for a criminal investigation to begin - was accepted by the local police on the same day, but reportedly only after the intervention from the Home Ministry. In the FIR, Shah Alam's family have named 16 people as being directly involved in

the beating and murder of Shah Alam. No one, however, has been arrested even though there is no obvious doubt about the identity of the assailants. No charges have been brought against anyone for this murder. At the same time, the brother of one of the assailants reportedly filed a case on 16 November 2003 against members of the Ahmadiyya community in the village, accusing them of taking non-Ahmadis hostage even though there has been no evidence of any such activity by the Ahmadis.

In the general elections of 1 October 2001, Bangladesh Nationalist Party, headed by Begum Khaleda Zia, won 191 out of 300 seats in parliament. It formed a coalition with three smaller parties which gave it a combined two third majority in Parliament. These parties are: Jamaat-e-Islami, Bangladesh which propagates transition to the rule of Islamic law and which won 17 seats in Parliament; Islami Oikya Jote (an alliance of seven radical Islamist groups) which also advocates transition to the rule of Islamic law and which won 2 seats in parliament; and Jatiya Party (NF), not a religious party, which won 4 seats in Parliament.

Anti-Ahmadi groups such as Khatme Nabuwat, are seeking to obtain the support of the two Islamic parties in the ruling four-party coalition to influence the government to declare the Ahmadis non-Muslim .

4. Street agitations against Ahmadis

The largest of the anti-Ahmadiyya agitations in the past six months took place on 21 November 2003. Moulana Moahmud Hossain Mumtazi, the leader of an Islamist group called Khatme Nabuwat, reportedly led thousands of young men on a march attempting to occupy an Ahmadi mosque in **Tejgaon** area of Dhaka. This event was followed by another big march on 5 December on the same mosque. During these events, the marchers were armed with sticks and bricks and were shouting hate slogans against Ahmadis. The group carried out similar anti-Ahmadiyya agitations every Friday of the week for several months, persisting in their demands for the Ahmadis to be declared non-Muslim.

The police took action to prevent the crowds from entering Ahmadi mosques. However, it took no action against the agitators who chanted anti-Ahmadi hate slogans, threatened to attack Ahmadis, and created an atmosphere of fear and intimidation for them.

5. The banning of Ahmadiyya publications

In a press release issued on 8 January 2004, the government announced that the publications of the Ahmadiyya community, including the Koran and any translations or interpretations of it, would be banned from the following day. No further information was made available and no government communication explaining this announcement was sent to members of the Ahmadiyya community. The government press release said the ban had been imposed "in view of objectionable materials in such publications that hurt or might hurt the sentiments of the majority Muslim population".

The ban highlighted the possibility that the government had yielded to pressure from anti-Ahmadi Islamist groups. According to reports in Bangladeshi newspapers, it had been imposed at the instigation of Islami Oikya Jote, a political party and junior partner in the coalition government (see box).

The ban openly defies international human rights safeguards guaranteeing freedom of religion. Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to which Bangladesh is a state party states:

> *"1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom,*

either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching."

In its General Comment on this article,, the Human Rights Committee (HRC) specifies that the freedom to manifest religion or belief *"extends to ritual and ceremonial acts giving direct expression to belief, as well as various practices integral to such acts, including the building of places of worship, the use of ritual formulae and objects, the display of symbols, and the observance of holidays and days of rest."* The HRC further states that *"the practice and teaching of religion or belief includes acts integral to the conduct by religious groups of their basic affairs, such as the freedom to choose their religious leaders, priests and teachers, the freedom to establish seminaries or religious schools and the freedom to prepare and distribute religious texts or publications."(2)*

Similarly, according to the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, the right to freedom of thought, conscience, religion or belief includes the freedom "[T]o write, issue and disseminate relevant publications in these areas."(3)

The right to freedom of expression is another fundamental human right and is provided for in Article 19 of the ICCPR:

"1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals."

There appears no basis for imposing the ban even under the Bangladeshi law. Fundamental rights including freedom of religion are guaranteed under Part 3 of the Constitution of Bangladesh. This is significant because the Constitution prohibits any laws inconsistent with the provisions of Part 3. Article 41.1 in Part 3 of the Constitution provides that:

"(a) every citizen has the right to profess, practise or propagate any religion;

(b) every religious community or denomination has the right to establish, maintain and manage its religious institutions;

In Part 3, the Constitution also prohibits discrimination on grounds of religion:

"28. (1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth".

The Constitution similarly guarantees freedom of expression. Article 39 of the Constitution provides

that:

"(1) Freedom of thought and conscience is guaranteed.

(2) Subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of the security of the State, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence-

(a) the right of every citizen of freedom of speech and expression; and

(b) freedom of the press,

are guaranteed"

While provisions for both these rights are subject to restrictions, the government's explanation for the ban, namely that the publications "hurt or might hurt the sentiments of the majority Muslim population of Bangladesh," cannot be accepted as reasonable grounds for restricting these rights. Members of religious majorities may often wish minorities to join the dominant religion, and feel hurt if they do not. This may be so especially in the case of sects of the same religion or separate religions relying on the same sources. However, accepting such wishes or feelings by majorities as legitimate reasons to limit minorities' religious freedom would legitimise widespread oppression of minorities. In its General Comment on Article 18, the HRC stated that it *"views with concern any tendency to discriminate against any religion or belief for any reason, including the fact that they are newly established, or represent religious minorities that may be the subject of hostility on the part of a predominant religious community."(4)*

The ban has therefore been imposed in defiance of safeguards for freedom of religion and expression in both the Constitution of Bangladesh and intentional human rights law. It is also openly discriminatory: it has prevented members of the community from issuing publications or press releases to defend themselves in the face of hate speeches and accusations levelled against them by anti-Ahmadi Islamist groups.

6. The latest development regarding the ban

In early March 2004, it came to the attention of members of the Ahmadiyya community that the government had issued an official circular to central, divisional and district officers naming some 20 Ahmadi publications to be banned. It was indicated in the circular that it had been sent to the government official press for publication in the official gazette. As of mid-April 2004, it had not been published in the official gazette but instruction has reportedly been sent to the police to remove these Ahmadi publications from circulation. The police are not known to have implemented these instructions save in a few instances.

Amnesty International has obtained an unofficial translation of this circular. It names a number of Ahmadi publications including the Koran and its commentary, stating that they have "defamed Islam, social and political harmony", and that their "publication, distribution, sale and preservation" are banned.

This action by the government has further aggravated the plight of the Ahmadiyya community. There are reports that local Islamist leaders in rural areas have been putting pressure on the local administration to allow them to enter Ahmadi homes and remove the banned publications.

Poor governance, corruption and nepotism have severely undermined the rule of law including safeguards in the Constitution to protect fundamental rights in Bangladesh. The ruling parties have routinely ignored human rights abuses by their own supporters or supporters of parties in alliance with them, allowing them impunity for such acts. A poorly trained and corrupt police force and a severely overloaded judicial system deprives the underprivileged and minority communities of access to justice. The failure of the government and the opposition to engage in a dialogue to reduce political tension in the country and strengthen the democratic process has further undermined the ability of institutions of the state to uphold the rule of law including safeguards against human rights violations. Consequently, a climate of impunity for acts of human rights violations in the country has prevailed.

Violations have included torture, deaths in custody, arbitrary detention of government opponents and others, excessive use of force leading at times to extrajudicial executions, the death penalty, attacks against members of minority groups, and acts of violence against women. Minority communities have often been the victims.

For more information on these human rights violations please refer to Amnesty International documents on: http://web.amnesty.org/library/eng-bgd/index

7. Amnesty international's recommendations

Amnesty International urges the Government of Bangladesh to rescind immediately the ban imposed on Ahmadi publications. The organisation further calls upon the government to declare publicly:

· Its full support for the right to freedom of religion in the country;
· That it would not yield to the demands of the Islamist groups which are discriminatory in nature and in violation of the rights of members of the Ahmadiyya community to practice their religion in an atmosphere free from fear, intimidation and persecution;
· That no acts of intimidation and violence against members of the Ahmadiyya community would be tolerated, and that all perpetrators of such acts will be brought to justice;
In addition, Amnesty International urges the Government of Bangladesh to institute an independent and impartial investigation by a competent authority into past attacks against the members of the Ahmadiyya community and the violation of their fundamental rights. In this regard:

· The inquiry should seek to identify the killers of Shah Alam, the Imam of a local Ahmadi mosque in the village of Raghanathpur Bak in Jessore District on 31 October 2003, and the beating of other Ahmadis at the time; it should make recommendations for the prosecution of those suspected of being responsible.
· The inquiry should seek to identify those involved in the "excommunication" and illegal house arrest, for about 25 days, of 17 Ahmadi families in the village of Uttar Bhabanipur in Kushtia District in October 2003; it should make recommendations for the prosecution of those suspected of being responsible.
· The inquiry should seek to identify local Islamist leaders and others who have engaged in chanting anti-Ahmadi hate slogans, and have marched to occupy Ahmadi mosques since October 2003; it should make recommendations for the prosecution of those suspected of being responsible.
· The inquiry should seek to establish if any police personnel has acted in connivance with those attacking the Ahmadis, and make recommendations for the prosecution of those suspected of such connivance.
All the inquiry's investigations and all subsequent judicial or other procedures must be carried out in accordance with relevant international standards.

Amnesty International urges the Government of Bangladesh to fully implement the recommendations of the investigation as soon as they become available.

What you can do: Please write to the Government of Bangladesh urging them to implement Amnesty International's recommendations as listed above.

Address to write to:
Prime Minister Begum Khaleda Zia
Office of the Prime Minister, Dhaka, Bangladesh

Faxes: 880 2 8113244 or 880 2 8113243 or 880 2 9133722 or 8802 8111015 or 8802 8151490 or 8802 8151157

Telex: 672802 PSEC BJ or 632220 RAPA BJ or 672803 PM SEC BJ

Email: pm@pmobd.org

****

(1) While the reason for the recent rise in anti-Ahmadi agitations is not immediately identifiable, the targeting of the Ahmadiyya community is believed to be a tactical measure by Islamist groups to force the government to yield to their political demand for the introduction of more stringent Islamic law in the country. The groups are hoping to obtain mass support through these agitations from the poor and disenfranchised sections of society whom they feel they could influence by appealing to their religious beliefs.

(2) Human Rights Committee, General Comment 22, Article 18 (Forty-eighth session, 1993). Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies. U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 35 (1994), para. 4.

(3) UN Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief. proclaimed by General Assembly resolution 36/55 of 25 November 1981, para. 6(d).

(4) Human Rights Committee, General Comment 22 (see footnote above)

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট ফ্যাক্স মারফত প্রেরিত 'এমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর সুপারিশমালা হুবহু উপস্থাপন করা হলো। এতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের প্রতি বিভিন্ন নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা নিরসনকল্পে এ সংস্থা বিভিন্ন সুপারিশের অবতারণা করেছে। আমরা এ সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক

প্রকাশক ঃ মাহবুব হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশাআত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস ৪ বকসি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মুদ্রিত ❑ সম্পাদনায় - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
Printed and Published by Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 ❑ Edited by Mohammad Mutiur Rahman